দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ২২ জুলাই, ২০২৪
৬ শ্রাবণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬
website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২২ জুলাই - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

মেঘবালক অভিষেকের বধ আসন্ন, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদির রঙে রং মেলাতে হবে! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

হিন্দুত্বকে বদনাম করার ভয়াবহ প্রয়াস

☐ জে. নন্দকুমার ☐ ৮

তাইওয়ানকে ঘিরছে চীন : উদ্বেগ দক্ষিণ এশিয়ায়

☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

রাষ্ট্রচেতনা বিরোধীরা সর্পগরলের চেয়েও মারাত্মক

☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১১

গণ পিটুনির রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে শুধু রামভক্তরা নয়, চরম মূল্য চুকাচ্ছে উদারপন্থী মুসলমানরা

☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৩

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে ☐ ১৬

হিন্দু সমাজকে সচেতন হতে হবে

☐ অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস ☐ ২০

বঙ্গের কৃষি বাস্তুতন্ত্রে সর্প-বৈচিত্র্য

☐ বাণীব্রত রায় এবং ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ২৩

বঙ্গের বাস্তুতন্ত্রে সর্প বৈচিত্র্য বাসস্থান, বহিরাকৃতি ও বিষাধার

☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৫

মোটেও ভয়ংকরী নন দেবী মনসা

☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

বাংলা সাহিত্যে ও লোক সাহিত্যে সর্প সংস্কৃতি ও সর্প বৈচিত্র্য

☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৩৫

সর্পাঘাত : প্রাথমিক প্রতিবিধান ও চিকিৎসা

☐ ডাঃ অমিত ভট্টাচার্য ☐ ৪৩

সর্পাঘাত রোধ কীভাবে? ☐ ডাঃ সোমনাথ ব্যানার্জি ☐ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৫০

প্রকাশিত হবে ২৯ জুলাই, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৯ জুলাই, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আমাদের জনজাতি সমাজ

জনজাতি সমাজ আবহমানকাল থেকে ভারতীয় সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রামায়ণ-মহাভারত-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে তার ভুরি ভুরি উল্লেখ রয়েছে। সহজ সরল এই জনজাতিদের ভারতের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার, ধর্মান্তরিত করার কাজ বিদেশিরা বহু বছর থেকে করে চলেছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন শ্রীপতি টুডু, ডা: চুনারাম মুর্মু, ইন্দ্রমোহন রাভা, অশোক কুমার ঠাকুর প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি উপকারী প্রাণী

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুকেই ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। উপনিষদ শিক্ষা দিয়াছে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ভারতবর্ষ কঙ্করের মধ্যেও শঙ্করকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সর্বভূতে আত্মবৎ উপলব্ধি করিয়াছে। তাই সৃষ্টির যাহা কিছু মঙ্গলময়, যাহা কিছু উপকারী, তাহাতেই দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহা সংরক্ষণ ও সংবর্ধণের চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃতির যে আপাত ভয়ংকর প্রাণী সর্প, তাহাতেও দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজার প্রচলন করিয়া সংরক্ষণের বার্তা দিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্পপূজার রীতি অতি প্রাচীন। দেশের সর্বত্র নাগদেবীর মন্দির রহিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে নাগপঞ্চমীর দিনে সর্পদেবীর পূজা হইলেও বঙ্গপ্রদেশে শ্রাবণ মাসে সংক্রান্তির দিনে ঘরে ঘরে মনসাপূজা হইয়া থাকে। বঙ্গপ্রদেশের সহিত পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মূলত সর্পভয় নিবারণার্থে সর্পদেবী মনসাকে তুষ্ট করিবার জন্য পূজা করা হইয়া থাকে। মধ্যযুগীয় বাংলা সহিত্যে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য লইয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন কবি কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ, নারায়ণ দত্ত, বিজয় গুপ্ত, হরি দত্ত, ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজবংশী দাস প্রমুখ। উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে ঘটপূজা হইলেও দক্ষিণ ও রাঢ়বঙ্গে বিশেষত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মানুষ দেবী মনসার মূর্তি গড়িয়া পূজা করিয়া থাকেন এবং তাহা দুর্গাপূজা ও দীপাবলীর ন্যায়ই মহা ধুমধাম সহকারে পালিত হইয়া থাকে। সেই সময় মনসার ভাসান গানে মাতিয়া ওঠে গ্রাম ও শহর।

সর্পকে মা মনসার বাহন বলা হইয়া থাকে। তাই হিন্দুরা সর্প নিধন করেন না। কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ নির্বিচারে সর্পহত্যা করিয়া থাকে। সমস্ত সর্প বিষধর নহে। মাত্র দশ শতাংশ বিষধর। বাকি সমস্তই বিষহীন। উভয় প্রকার সর্পই শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থেই দর্শন করিয়া থাকে। নির্বিচারে সর্পহত্যার কারণে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস শুধুমাত্র মানুষের পক্ষেই নহে, বাস্তুতন্ত্রের উপরেও ভয়ানক হুমকিস্বরূপ। খাদ্যশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণে সর্পকুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, পৃথিবীতে কুড়ি কোটি মানুষের খাদ্যশস্য ইঁদুরে নষ্ট করিয়া থাকে। আর ইহা হইয়া থাকে শুধুমাত্র সর্পসংখ্যা হ্রাস পাইয়া ইঁদুরের বংশবৃদ্ধির কারণে। আবার, ইঁদুরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহাও মনুষ্য সমাজের পক্ষে হুমকিস্বরূপ। সর্পকুল ইঁদুর ভক্ষণ করিয়া বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে। ইহা ব্যতীত বহু রোগের জীবনদায়ী ঔষধ সর্পবিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আপাত ভয়ংকর এই প্রাণীটি মানব সমাজের পক্ষে খুবই উপকারী। এইরূপ একটি উপকারী প্রাণীকে মানুষ শুধুমাত্র অজ্ঞানতাবশত হত্যা করিয়া থাকে।

সুখের বিষয় হইল, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিতে দেশে-বিদেশে সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি স্তরে সর্প সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭ জুলাই তারিখটিকে বিশ্ব সর্প দিবস রূপে পালন করা হইতেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ সর্পদংশনে মারা যায়। গ্রামবাসীরাই সাধারণত সর্পদংশনের শিকার হইয়া থাকেন। অনেক সময় যোগ্য প্রতিষেধক অথবা আধুনিক চিকিৎসার অভাবেই তাহারা প্রাণ হারান। মানুষকে সচেতন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই সর্প ও মানুষ উভয়ই রক্ষা পাইবে। আজ প্রমাণ হইয়াছে, সর্প নহে, মানুষই সর্বাপেক্ষা ক্রূর প্রকৃতির। সর্প আত্মরক্ষার তাগিদেই আঘাত করিয়া থাকে কিন্তু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ নির্দোষ নিরীহকেও হত্যা করিতে দ্বিধা করে না।

সুভাষিতম্

সর্পঃ দুর্জন মধ্যে বরম্ সর্পো ন দুর্জনঃ।
সর্পো দশতি কালেন দুর্জনস্তু পদে পদে।।

সাপ ও দুর্জনে মধ্যে সাপকেই ভালো বলা যায়। কেননা সাপ কদাচিৎ দর্শন করে কিন্তু দুর্জন পদে পদে দংশন করে।

মেঘবালক অভিষেকের বধ আসন্ন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

শুনলাম এবার 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'। বগা কে? পরে বলছি। মুসলমান তোষণে বিদেশি সিপিএম আর তৃণমূলের অনেক মিল। এক সময় মুসলমান ভোটেই বিদেশি সিপিএম জিতত। ২০১১-তে সিপিএমের ৮ শতাংশ ভোট সরে পতন হয়। মূলে ছিল মমতার দুধেল গাই (মুসলমান ভোটার)। সরকারি নির্দেশ জারি করে মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছিল বিদেশিরা। ৪২টি ওবিসি গোষ্ঠীর ভিতর ৪১টি মুসলমান গোষ্ঠী ছিল। ২০১২ সালে মমতা ওই আইন পাশ করিয়ে ওবিসি তালিকায় ৬৫ শতাংশ মুসলমান গোষ্ঠীর জায়গা করে দেন।

ভোট জিততে মমতার কাছে ইসলাম স্বধর্ম আর হিন্দু ভয়াবহ পরধর্ম। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে গতবারের তুলনায় অর্ধেক মুসলমান প্রার্থী দিয়েও ৯২ শতাংশ ভোট পায় তৃণমূল। এ রাজ্যের বেশিরভাগ মুসলমান মমতার দুর্বলতার সুযোগ নেয়। কংগ্রেস আর সিপিএমের জমানাতে এরা সমান সুবিধাভোগী ছিল। অনেকে ঠাট্টা করছেন, 'ইস, মমতা কী দুর্ভাগা! হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মেছেন অথচ মুসলমানদের ভোটেই নির্বাচন জিতছেন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তাই বলেছেন যাঁরা মুসলমান হয়ে জন্মায়নি তাঁরা দুর্ভাগা। মমতাও তাই। মমতা পরস্পর বিরোধী দাবি করেছেন। একদিকে বলেছেন হাকিমের কথা তিনি শোনেননি, অন্যদিকে জানিয়েছেন ওটা ব্যক্তিগত মত। অনেকদিন থেকেই তৃণমূলের মুসলমান মুখ ফিরহাদ হাকিম।

তাই হাকিম নিজেকে সাচ্চা মুসলমান সাজিয়ে মমতা আর অভিষেককে মোক্ষম দাওয়াই দিতে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছেন। তার কথা মেনে নিলে মমতাকে ছিঃ বা লজ্জাহীন বলতে হবে। ইসলামে হাকিম যেমন চিকিৎসক তেমনই তিনি মুসলমান আইন (শরিয়তি) বা 'ফিক' ব্যাখ্যা করার অধিকারী। যাদের বলে মমতা বলিয়ান সেই ধর্মে নিধন মমতা মাথা পেতে নেবেন। মমতার কাছে হয়তো ইসলামেই নিধন শ্রেয়। মমতা জানেন এ রাজ্যে হিন্দু ভোট ভাগ হয় আর তার সিংহভাগ পায় বিজেপি। তাই 'হিন্দুধর্ম' পরধর্ম। মুসলমান ভোট এককাট্টা থাকে। অনেকদিন ধরে রাজ্য-রাজনীতি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নাকি আমেরিকার মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন।

সম্প্রতি রাজনৈতিক মহল আর শাসক তৃণমূলের অন্দরে তাঁর সম্ভাব্য গ্রেপ্তারি নিয়ে কানা-ঘুষো চলছে। তৃণমূলের এক জাঁদরেল নেতা তেমন ইঙ্গিত দিলেন। জাল কেটে আর

এখন সারা দেশে ১৩ রাজ্যে কংগ্রেস শূন্য (০)। তিনটি লোকসভা ভোটে তারা ১০০-র নীচে। মন্ত্রী হাকিমের কথা মানলে মমতার হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ দুর্ভাগ্যের।

কতদিন ঘুরবেন অভিষেক? একসঙ্গে মমতার নামও উচ্চারিত হচ্ছে। অভিষেককে কতদিন রাজনৈতিক আঁচলের আড়ালে রাখবেন মমতা। তৃণমূল দল গুন্ডা আর সমাজবিরোধী পোষে এটা নতুন অভিযোগ নয়। নতুন হলো কিছু মাজা ভাঙা আর শিরদাঁড়াহীন আমলার ভূমিকার। তাঁরাও ওই পোষা গুন্ডাদের মতোই ব্যবহার করছেন। ২০২১-এর পর থেকে তৃণমূলের রশি মমতার হাতে নেই। মমতা তৃণমূলের সর্বক্ষণের প্রচারকর্মী। অভিষেকের মাধ্যমে আসা পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক মমতাকে ওই ভূমিকা দিয়েছে। এই বছরই রাজ্যপাটে লেখা হয় মমতাকে আই-প্যাক প্যাক আপ করে নিয়েছে। তৃণমূলের মধ্যে একটা সামগ্রিক রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব আছে।

চারটি উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয় বিজেপির ভবিষ্যৎ পরাজয়কে নিশ্চিত করে না। শাসকরাই উপনির্বাচন জেতে। ৭ রাজ্যের মধ্যে ৪ রাজ্যে বিজেপি বিরোধী জোট ক্ষমতায় ছিল। ১৩ আসনের ভিতর তাদের ১০ আসন ছিল। সেটাই থেকে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩ আসন ছাড়া বিজেপির কোনো আসন ছিল না। এবার তারা ৩ আসন হারলে নতুন করে হিমাচল আর মধ্যপ্রদেশে ২ আসন জিতেছে। ২০১৪ পর থেকে ১০ বছর কংগ্রেস কোনো বিধানসভা নির্বাচন জেতেনি। কর্ণাটক আর হিমাচল জিতে তাদের হারার গেরো কাটে। এখন সারা দেশে ১৩ রাজ্যে কংগ্রেস শূন্য (০)। তিনটি লোকসভা ভোটে তারা ১০০-র নীচে। মন্ত্রী হাকিমের কথা মানলে মমতার হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ দুর্ভাগ্যের। রাহুলকে দেশনেতা ভাবা সমান দুঃস্বপ্নের। আর এসবের মাঝে 'ফান্দে পড়িয়া অভিষেক বগা কান্দে রে'।

দিদির রঙে রং মেলাতে হবে!

রঙিনেষু দিদি,

আচ্ছা দিদি আপনি কি সত্যিই রাজ্য সরকারকে একটা ক্লাব মনে করেন? আমরা জানি আর্জেন্টিনার রং নীল-সাদা। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রংও নীল-সাদা! কে ঠিক করল দিদি? বিধানসভায় কি এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়েছে? আমার যত দূর মনে পড়ছে তা হয়নি। আমরা রং দিয়ে ক্লাব চিনি। লাল-হলুদ মানে ইস্টবেঙ্গল, সবুজ-মেরুন মানে মোহনবাগান আর নীল-সাদা মানে রাজ্য সরকার! হাস্যকর। অপরাধ নেবেন না দিদি, সত্যিই হাস্যকর।

মহাকরণের রং লাল ছিল বরাবর। কলকাতা পুরসভার ভবনটির রংও এখনকার মতো বরাবরই লাল ছিল। এর সঙ্গে সিপিএমের ক্ষমতায় থাকা বা না থাকার কোনও শর্ত ছিল না। এখনও নেই। তবে সংবাদমাধ্যমে 'বড়ো লালবাড়ি' আর 'ছোটো লালবাড়ি' বলে উল্লেখ করা হতো। আপনি যখন বাস্তু মেনে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে রাজ্যের প্রধান সচিবালয় নিয়ে গেলেন তখন সেই বাড়িটার রং নীল-সাদা করা হয়। কিন্তু তাই বলে রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট রং হতে পারে এটা তখনও ভাবিনি। আমার যত দূর মনে পড়ছে, আপনার 'সাম্প্রদায়িক মন' মাদার টেরেজাকে স্মরণ রেখে একটি সম্প্রদায়কে খুশি করতেই টেরেজার শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে এই রং নির্বাচন করেছিল।

তা বলে, পশ্চিমবঙ্গের 'নিজস্ব রং' বলে কিছু রয়েছে, এমন কথা আগে কখনও শোনা যায়নি। কিন্তু স্বয়ং আপনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে সম্প্রতি প্রশ্ন করেছেন, উত্তরবঙ্গে বাড়ির ছাদ রং করতে কেন রাজ্যের নিজস্ব রং ব্যবহার করা হচ্ছে না? নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে আপনি এমনটাও বলেন যে, উত্তরবঙ্গের বাড়ির ছাদে নাকি লাল ও গেরুয়া রঙের টিন ব্যবহার হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে কোনও আসন না জেতার পরে এটা আপনার মনে হয়েছে। সঙ্গে বলেছেন, মেট্রো স্টেশনের গায়ে গেরুয়া রং লাগানো হচ্ছে। এখানেই না থেমে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন টিন সরবরাহকারীদের জানাতে হবে যে, লাল বা গেরুয়া রাজ্যের রং নয়। পূর্ত দপ্তরকে 'নবান্নের রং' সকলকে পাঠানোর নির্দেশ দিতে বলেছেন আপনি।

কেন জানি না, নবান্নের রং নীল-সাদা হওয়ার পরে তা আবার আপনার দল তৃণমূলের রং বলেও পরিচিত হয়ে গিয়েছে। এর ব্যবহার সর্বত্র ছড়ানোর চেষ্টা আপনি অনেক দিন ধরেই চালাচ্ছেন। রাজ্যে যত প্রশাসনিক ভবন, হাসপাতাল, সরকারি স্কুল, রাজপথের রেলিং-সহ নানা জায়গায় নীল-সাদা অনেক দিন ধরেই ব্যবহার হচ্ছে। পাশাপাশি এমন ঘোষণাও করা হয়েছে যে, বাড়ির রং নীল-সাদা করলে পুরসভা কর কম নেবে। তবে সেই লোভে নীল-সাদা রং রাজ্যের বসতবাড়িতে তেমন ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এতেই আপনি ক্ষুব্ধ। তাই বলে দিলেন, টিনের বাড়ির চাল নীল-সাদা করতে হবে। কিন্তু কেন?

সরকারি প্রকল্পে প্রাপ্ত আবাসের স্বত্বাধিকারীও কিন্তু নাগরিক। সেটা তার প্রাপ্য। তার রং নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকাই উচিত। কোনও নাগরিক তাঁর পছন্দের রঙে বাড়ির ছাদ, দেওয়াল, সব কিছু রাঙাতে পারেন। আপনি সে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেন না।

সামান্য কিছু কর বাঁচানোর বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকেরা অবশ্য তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে রাজি নন। কিন্তু আমার কাছে দুটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এক, 'রাজ্যের রং' বলে কি আদৌ কিছু হতে পারে? দুই, যদি-বা হয়, তা প্রশাসন নির্ধারণ করতে পারে কি? সে এক্তিয়ার কি সরকারের শীর্ষব্যক্তি মানে আপনার রয়েছে? আপনি নিজের মনের মতো করে 'রাজ্য দিবস' ঠিক করেছেন। যাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নেই। 'বাংলার সংগীত' নির্বাচন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাও বদলে দিয়েছিলেন। পরে শুনেছি সেটা বাতিল করেছেন।

সে যাই হোক, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতার এতটা এক্তিয়ার কি রয়েছে? ক্ষমতার সীমার শেষ কোথায়, সেটাও তো জানা দরকার দিদি।

মনে রাখতে হবে, সরকারি প্রকল্পে প্রাপ্ত আবাসের স্বত্বাধিকারীও কিন্তু নাগরিক। সেটা তার প্রাপ্য। তার রং নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকাই উচিত। কোনও নাগরিক তাঁর পছন্দের রঙে বাড়ির ছাদ, দেওয়াল, সব কিছু রাঙাতে পারেন। আপনি সে স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেন না। যেমন আপনি ছবি আঁকেন নানা রঙে। এবার থেকে শুধু নীল আর সাদা রং ব্যবহার করেই ক্যানভাস রাঙাবেন নাকি! □

অতিথি কলম

জে. নন্দকুমার

হিন্দুত্বকে বদনাম করার ভয়াবহ প্রয়াস

হিন্দুত্বের মধ্যে সময়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে নিজেদেরকে পরিবর্তন করা এবং নতুন আবিষ্কার করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমরা অতীতকে গর্ব করি, ভবিষ্যতের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখি— মাতৃভূমিকে গৌরবের চরম শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশি ধ্যানধারণার বদলে আমাদের বিচার ও দর্শনকেই মান্যতা দিই।

তথাকথিত উদারপন্থী, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও ইসলামের ধ্বজাধারী লোকেরা একজোট হয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে তারা সফল হতে পারেনি। গত লোকসভা নির্বাচনে কিছুটা ভালো ফল করায় দেশের মধ্যে তারা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। এসব করছে হিন্দুসমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য।

এটা সেই নেহরুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতার আবহে হিন্দুকেই বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। প্রত্যেক হিন্দুর নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা কর্তব্য, এই মনে করে বিরোধ করা উচিত। রাহুল গান্ধী বিজেপি নেতৃত্বকে আঘাত করার যে অপচেষ্টা করছিল তা অনেক রাজনৈতিক সমালোচক ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে। রাহুল গান্ধী ভগবান শিবের ছবি নিয়ে যে মজা করছিল তার মধ্যে এই কুমতলব লুকিয়ে ছিল।

সমাজকে দুর্বল করা : আসলে বিদেশি শক্তির যোজনানুসারে এইসব হিন্দু সমাজকে দুর্বল ও বিভাজিত করার সতত চেষ্টা মাত্র। এটা সেই শক্তি যা ভ্রান্ত আর্য-দ্রাবিড় তত্ত্বকে সামনে রেখে সমাজকে ভাগ করার অপচেষ্টা। এরা এখন আবার এক নতুন পদ্ধতি চালু করতে চাইছে। এরা হলো সেই লোক যারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ভগবান রামকে উত্তর ভারতীয় ও আক্রমণকারী বলে দক্ষিণ ভারতে 'মুরুগণ সম্মেলন' (কার্তিক ঠাকুর) চালু করার চেষ্টা করছে।

কিছুদিন আগে এক ডিএমকে নেতা প্রশ্ন তুলেছে— রাম কে? দক্ষিণে রামের কোনো প্রভাব নেই। এইসব প্রসঙ্গ সামনে এনে জনমানসে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে। এই মিথ্যা অপবাদকে প্রতিপন্ন করতে গত বছর কেরালাতে 'কাটিং সাউথ'--- সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, যাতে বাম ও কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন ছিল। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের পুত্র হিন্দু ধর্মকে হটানোর কথা বলে প্রথমেই তার উদ্দেশ্য প্রচার করেছে। লোকসভাতে রাহুল গান্ধী বিজেপি সদস্যদের আক্রমণ করে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছে তা শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের মধ্যে ভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা স্থাপিত করার চেষ্টা করছে। তারা যে বিভেদ সৃষ্টি করে গলাবাজি করছে তার প্রকৃত অর্থ আমাদের বোঝা উচিত। কিছু বিদ্বান লোকের 'হিন্দুধর্ম' শব্দে সমস্যা আছে, কারণ তারা ইজম্-এর অর্থ কেতাবি অন্ধবিশ্বাস নিয়ে চলে। তারা স্বদেশি দর্শন ও বিশ্বাস প্রকট করতে হিন্দুধর্মের বদলে হিন্দুত্ব শব্দ ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী।

হিন্দুত্ব কোনো ধর্ম নয়, এক জীবন পদ্ধতি। ধর্ম হলো সেটাই যা মানুষকে দেবত্বে উত্তরণ ঘটায়। সংস্কৃতে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি 'ধৃ' ধাতু থেকে, যার অর্থ ধারণ করা। এটা সেই তত্ত্ব যা সমাজ ও পরিবারকে জুড়ে রাখে। ইংরেজিতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ধর্মের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এটাই হলো ভারতের মৌলিক বিচার যা সামঞ্জস্যপূর্ণ বুদ্ধির বিকাশ করে।

হিন্দুধর্মের সার্বিক দৃষ্টি : হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম মানুষকে শুধু ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় না, বরং পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করে। এই জন্য বলা হয়— শিবো ভূত্বা, শিবম্ যজেৎ। অর্থাৎ শিব হয়ে শিবকে পূজা করো। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। এটাই হিন্দুধর্মের সার্বিক ভাবনা। দ্বেষহীন বা দুর্ভাবনাযুক্ত, চার্বাকের ভৌতিকবাদ, লোকায়ত প্রাতিষ্ঠানিক যে কোনো বিষয়কে হিন্দুত্ব সমাবেশিত করতে পারে। কিন্তু সেই দর্শন ও সিদ্ধান্তকে সমাবেশিত করে না যা আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

উদাহরণস্বরূপ ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছেন— 'ধর্ম হলো সেটাই যা সমাজকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে। যা সমাজকে ভাগ করে, লোকের মধ্যে বিবাদ করায় তা অধর্ম। সর্বোচ্চ প্রাপ্তি এবং ছোটো ছোটো কাজকে নিজের মনে সর্বোচ্য স্থান দেওয়ার নামই ধর্ম। নিজে এরূপ করলেই ধর্ম পালন করা হয়। মনের মধ্যে অন্যভাব পোষণ করে আস্তিক হওয়ার ভাব দেখালেও প্রকৃত আস্তিক হওয়া যায় না। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলেই সর্বদা ধার্মিক হওয়া যায়।'

হিন্দুধর্ম সাধককে যে কোনো বিচার ও মতকে পোষণ করার স্বাধীনতা দেয়। এখানে ব্যক্তি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে। কোনো মতকে মানতে বা অস্বীকার করতে পারে। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন— 'হিন্দুধর্ম মানুষকে নিজের বিচার অনুযায়ী চলার স্বাধীনতা দেয়। কখনও মনুষের ভাবনা, বিচারের ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বাধা দেয় না। হিন্দুধর্ম হলো স্বাধীন যা আস্থা ও পূজাপদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে। এটি ঈশ্বরীয় প্রকৃতি, আত্মা, পুজাপদ্ধতি, সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে মানবিক বিচার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার স্বাধীনতা দেয়। কোনো বিশেষ আচার ও অনুষ্ঠান স্বীকার করতে কাউকে বাধ্য করে না। প্রত্যেককে চিন্তা করতে, বিচার করতে, প্রশ্ন করতে স্বাধীনতা দেয়।

হিন্দুত্ব এক দর্শন : কোনো বিশেষ ধর্মগ্রন্থ বা পূজা পদ্ধতিকে হিন্দুত্ব প্রাধান্য দেয় না। এমনকী হিন্দুদের দ্বারা পূজ্য বেদও অন্তিম প্রামাণ্য

ধরা হয় না। কোনো হিন্দু বেদে উল্লেখিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে পারেন। আদি শঙ্করাচার্য 'শঙ্করভাষ্য'তে বলেছেন— 'শেতো অগ্নি অপ্রকাশো বা ইথি ব্রুবন শ্রুতি শতমপি ন প্রমাণমুথৈথি'। অর্থাৎ যদি বেদে লেখা থাকে আগুন শীতল এবং আলো দেয় না তাহলে আমি অস্বীকার করব। কিন্তু ক্ষেত্রে ভগবতগীতা বেদে উল্লেখিত বিষয়ে প্রশ্ন ওঠায়। হিন্দুত্ব ব্যক্তিগত অনুভবকে প্রাধান্য দেয় এবং এটাই একমাত্র সত্য।

উপনিষদ, বেদ এগুলি হলো আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক। প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা নিজের রাস্তায় চলতে স্বাধীন। বিদ্বান ও অশিক্ষিত উভয়েই নিজস্ব অনুভূতি ও রাস্তায় চলার সমান অধিকার আছে। হিন্দুধর্মে কেউ বলতে পারবে না যে তার কাছে আধ্যাত্মিক সত্য বা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা জানা আছে। অনেক নিয়মের মধ্যে একটি জানা থাকতে পারে। এইজন্য আমরা বলি হিন্দুত্ব একটি বিশ্বাস নয়, দর্শন। ভগবান কৃষ্ণ গীতাতে সুন্দরভাবে বলেছেন— মানুষ যেমন ভাবে আমার কাছে আসে, আমি তেমনই তাকে সাদরে গ্রহণ করি। হে পার্থ, মানুষ বিভিন্ন রাস্তায় আমার কাছে আসে।

এইজন্য জোর দিয়ে বলা যেতে পারে, কোনো বিচার পদ্ধতি যা অন্য মত বা আস্থার প্রতি বিশ্বাস রাখে না তা হিন্দুত্বের অংশ নয়। একবার শ্রীঅরবিন্দ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে জীবনে সত্য আচরণ বজায় রাখতে ধর্মের মূল্যবোধকে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে শামিল করা উচিত। কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রঙ্গা হরিজীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কেরালার প্রাক্তন মুখ্য সচিব ড: ডি. বাবু পল (একজন খ্রিস্টান) বলেছিলেন— 'হিন্দুধর্মের প্রতি হিন্দুদের বেশি আস্থাবান হওয়া মানবতার জন্য আশীর্বাদ হবে'।

হিন্দুত্বের মধ্যে দার্শনিক ভিত্তিকে ঠিক রেখে পরস্পর বিরোধী মত ও বিশ্বাসকে সমাবেশিত ও আত্মসাৎ করার মধ্যে যথেষ্ট শক্তি আছে। এখানে নতুন মতকে কখনও ঘৃণা করা হয় না, বরং সকলকে গ্রহণ করে। হিন্দুত্বে বিভিন্ন দিক থেকে উৎকৃষ্ট মত এসে শামিল হয়েছে। সেগুলোকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি, প্রয়োগ করেছি। তার ফলে নিজস্ব ভিতের উপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছি। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে সত্যাসত্য বিচার করা, বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অকাট্য জ্ঞান লাভ করার পদ্ধতি নিহিত আছে। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কখনও বিরোধ হয়নি, কারণ সত্যানুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা হয়েছে। আমাদের ঋষিগণ রহস্যময় ও যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানকে আলাদা চোখে দেখেননি। তাঁরা সত্যকে জানা ও অনুভব করার জন্য যোগের মতো প্রক্রিয়াকে বিকশিত করেছেন। হিন্দুদের বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ অদ্বৈত দর্শন থেকে পাওয়া, যেখানে বলা হয়েছে— ব্রহ্মাণ্ড একটি পদার্থ যার আকার সদা পরিবর্তনশীল। আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ এবং আমাদের জীবন ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে গতিশীল। হিন্দুধর্মের মতে ব্রহ্মাণ্ড হলো ঈশ্বরের শরীর এবং সমস্ত জড় ও জীবের অংশ।

গুরু প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

ঈশ্বর সম্পূর্ণ, অবিভাজ্য, সর্বব্যাপী অর্থাৎ জড় ও জীবের মধ্যে বিদ্যমান। গুরু যিনি ঈশ্বরের চরণ দর্শন করেছেন তাঁকে আমি প্রমাণ করি। সুতরাং একজন হিন্দুর কাছে এইরকম বোধপূর্ণ মানসিকতা বজায় রাখা নৈতিকভাবে বাধ্যতাপূর্ণ, কারণ প্রকৃতির ক্ষতি করতে চাইলে নিজের ক্ষতি হয়।

হিন্দুত্ব ও গণতন্ত্র : একবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীরাজেন্দ্র সিংহজীকে এক বিদেশি সংবাদদাতা গণতন্ত্র কেমন— যা পশ্চিমি সভ্যতার বিশ্বকে দেওয়া একটি উপহার— প্রশ্ন করলে তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দেন— 'পাকিস্তান একই সময়ে গণতন্ত্র গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ। আপনি এই দেশগুলোর গণতন্ত্রের স্বরূপ জানেন।' গণতন্ত্রের ভাবনা ভারতের জন্য আলাদা ছিল না। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে সভা, সমিতির উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ বলে, রাজার স্থায়িত্ব পূর্ণ নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গণতন্ত্রের বিভিন্ন স্বরূপ ও সিদ্ধান্তের উপর নাগরিকের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধযুগেও অনেক রাজ্যের রাজা চয়ন করতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ইতিহাস বলে— বৈশালীর রাজাকে বিশাল রাজ্যের জনগণ চয়ন করেছে। মহাত্মা গান্ধী যখন 'গ্রামস্বরাজ'-এর কথা বলেন— তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্বপুরুষদ্বারা বিকশিত গণতন্ত্রের প্রাচীন ও মজবুত সিদ্ধান্ত আধারিত সামাজিক- রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলি পুনঃপ্রবর্তিত করা।

নেহুরুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা ও হিন্দুত্ব : নেহরুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা বলে যা প্রচার করা হয় তা ভারতের পক্ষে অনুকূল নয়। যেখানে রাজনৈতিক লাভের চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধ প্রকট করা হয়েছে এবং তথাকথিত অল্পসংখ্যক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় মুখ্যধারার সঙ্গে মিলতে বাধা দিয়েছে। নেহরুবাদী পন্থনিরপেক্ষতার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বরিষ্ঠ পত্রকার মাধব নলপত লিখেছেন— এটা স্পষ্ট যে নেহরু বিভাজনের বিভীষিকা নিয়ে এতটাই ভীত ছিলেন, ভবিষ্যতে ধর্মের ভিত্তিতে পুনরায় দেশ বিভাজন না হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে অল্পসংখ্যককে আলাদা রাখা। নেহরু এই জন্যই নির্দিষ্টভাবে 'পার্সোনাল ল'-এর মতো বিষয়কে অল্পসংখ্যকের অধিকার হিসেবে প্রয়োগ করলেন। নেহরুবাদী পন্থনিরপেক্ষতা এসেছে অসুরক্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্বল সমাজ থেকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদেরকে বিভাজিত রাখা এবং অল্পসংখ্যকদেরকে একত্রে রাখা। অর্থাৎ বিশ্বাসহীনতাপূর্ণ একতাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা।

শ্রীঅরবিন্দ এই নকল একতাকে উৎসাহ দেওয়ার বিপদ সম্বন্ধে বলেছেন— মৃত ও জড় বস্তুর একতার বৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় অবনমনের সূচকাঙ্ক, সেই রকমই জীবিত একতার বৃদ্ধি রাষ্ট্রীয় মহানতার সূচকাঙ্ক হয়। আশ্চর্যের কথা যে, নেহরুর পন্থনিরপেক্ষতার সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন তাঁরই ক্যাবিনেট সহযোগী— কে.এম. মুন্সী। তিনি বলেছেন— 'সেকুলারিজম বিষয়ে ধর্মবিরোধীরা একটা শক্তি, যা প্রচলিত সেকুলার ও সাম্যবাদ দ্বারা চালু হয়। এরা বহুসংখ্যক গোষ্ঠীর ধর্মপরায়ণতা ও ভক্তিকে নিন্দা করে। এদের পক্ষ ধরে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদেরা এক আশ্চর্য ফতোয়া জারি করে, যা সংখ্যালঘুদের উপাসনা ও সামাজিক রীতিনীতিকে স্বীকার করে কিন্তু সংখ্যাগুরুদের ক্রিয়াকলাপকে সাম্প্রদায়িক ও অসামাজিক বলতে থাকে। এইভাবে 'সেকুলারিজম' শব্দের অপপ্রয়োগ যদি চলতে থাকে তাহলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার গতি কমতে থাকবে। কে.এম. মুন্সীর আশঙ্কা তখনকার মতো আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

এস.এন. বালগঙ্গাধর 'Reconceptualising India Studies'— বইতে লিখেছেন, এই ধরনের পন্থনিরপেক্ষতা হিংসা উৎপন্ন করে। আমরা এও দেখেছি নেহরুবাদী সমর্থকেরা কীভাবে শ্রীরামজন্মভূমি মামলাতে মিথ্যা ও জাল তথ্যের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ভারতের ভবিষ্যৎ : হিন্দুত্বের মধ্যে সময়ের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে নিজেদেরকে পরিবর্তন করা এবং নতুন আবিষ্কার করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আমরা অতীতকে গর্ব করি, ভবিষ্যতের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখি— মাতৃভূমিকে গৌরবের চরম শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশি ধ্যানধারণার বদলে আমাদের বিচার ও দর্শনকেই মান্যতা দিই।

(লেখক প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক)

তাইওয়ানকে ঘিরছে চীন : উদ্বেগ দক্ষিণ এশিয়ায়

চীনের ভীতি প্রদর্শনের ক্রমবর্ধমান প্রচার কৌশলের অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাইওয়ানের আশেপাশে চীনকে বেশ ক'টি বড়ো আকারের সামরিক মহড়া চালাতে দেখা গিয়েছে।

তাইওয়ানের প্রতিরক্ষায় চীনের বিপদসংকেত থামার কোনো লক্ষণ আপাতত নেই। গত মে মাসের শেষে তাইওয়ানের চারপাশে দুই দিনের সামরিক মহড়া চালিয়েছিল চীন। আর এবার জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে তাইওয়ানের আকাশ সীমায় অনুপ্রবেশ করলো ৬৬ চীনা যুদ্ধবিমান। সংবাদসংস্থা এএফপি সূত্রের খবর, জেট বিমানগুলিকে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজগুলিকে স্ব-শাসিত দ্বীপ তাইওয়ান দখল ও বিচ্ছিন্ন করার অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছিল মে মাসের শেষে এক মহড়ায়। চীনের সামরিক বিশ্লেষকরা সেই সময় জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে বুঝিয়েছিলেন, 'তাইওয়ানকে তার 'চালিকাশক্তি কেন্দ্র' থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছে তাইওয়ানের নেতৃবন্দ, তাই বন্দর ও বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে এই মহড়াগুলো চালানো হয়।' আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা এই প্রেক্ষিতে বলছেন, বেজিং তাইওয়ান নামক স্বাধীন গণতান্ত্রিক দ্বীপটিকে তার ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিও অস্বীকার করে না।

তাইওয়ানের কেন্দ্রীয় সম্প্রচার কেন্দ্র সিসিটিভি'র সূত্রে জানা গিয়েছিল, '২৪ মে সকালে মহড়া শুরু হয়। গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলোতে নকল হামলা চালানোর লক্ষ্যে তাইওয়ানের চারপাশে বিমান ও নৌযানগুলো ঘিরে ফেলা হয়।' তাইওয়ানের নতুন প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে দায়িত্ব নেওয়ার তিন দিন পর তার উদ্বোধনী বক্তৃতার প্রেক্ষাপটেই 'জয়েন্ট সোর্ড-২০২৪' এই সাংকেতিক নামে মহড়াটি শুরু করা হয়েছিল। চীন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের উল্লেখিত বক্তব্যকে 'স্বাধীনতার স্বীকারোক্তি' বলে নিন্দাও করেছিল। বেজিঙের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র উকিয়ান বলেছিলেন, লাই তাইওয়ানকে 'যুদ্ধ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি'র দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি এও বলেন, ''যতবার 'তাইওয়ানের স্বাধীনতা' বলে তারা আমাদের উসকে দেবে, ততবারই আমরা আমাদের পালটা ব্যবস্থার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাব, যতক্ষণ না আমাদের মাতৃভূমির পূর্ণাঙ্গ পুনর্মিলন অর্জিত হয়।'

এদিকে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক গত ৪ জুলাই জানিয়েছে যে, তারা তাদের দ্বীপের চারপাশে ২৪ ঘণ্টায় ৬৬টি চীনা সামরিক বিমানের উপস্থিতি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা চলতি বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড। এদিকে ১১ জুলাই এএফপি'র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, মাত্র একদিন আগেই তাইওয়ানের কাছাকাছি ফের সামরিক মহড়াও চালিয়েছিল বেজিং। তার পরদিনই তাইওয়ানের আকাশে অনুপ্রবেশ করেছে চীনের ৬৬টি যুদ্ধবিমান। গত ১০ জুলাই বেজিং দাবি করেছিল যে, ওই যুদ্ধবিমান পিএলএ বিমানবাহী রণতরী শানডঙের সঙ্গে অনুশীলনের জন্য পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাচ্ছিল। ১১ জুলাই এক বিবৃতিতে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় দ্বীপের আশেপাশে ৬৬টি পিএলএ যুদ্ধবিমান এবং সাতটি চীনা জাহাজ শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৬টি যুদ্ধবিমান সংবেদনশীল মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক দাবি করেছে যে, তারা পরিস্থিতি নজরে রাখছে এবং এর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে।

এর আগে গত মে মাসে তাইওয়ানের চারপাশে চীনের ৬২টি যুদ্ধবিমান এবং ২৭টি জাহাজ ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তাইওয়ান নিজেদের স্বাধীন দ্বীপ মনে করলেও চীন বরাবরই একে তাদের মূল ভূখণ্ডের অংশ বলেই মনে করে। প্রসঙ্গত, তাইওয়ান ১৯৪৯ সাল থেকে স্বশাসিত। মূল ভূখণ্ডে গৃহযুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে পরাজয়ের পর জাতীয়তাবাদীরা দ্বীপে পালিয়ে গিয়ে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে। চীনের ভীতি প্রদর্শনের ক্রমবর্ধমান প্রচার কৌশলের অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাইওয়ানের আশেপাশে চীনকে বেশ ক'টি বড়ো আকারের সামরিক মহড়া চালাতে দেখা গিয়েছে।

তাইয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক গত ৪ জুলাই জানিয়েছে যে, তারা তাদের দ্বীপের চারপাশে ২৪ ঘণ্টায় ৬৬টি চীনা সামরিক বিমানের উপস্থিতি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা চলতি বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড। তাইওয়ানের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসন নিয়ে মার্কিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্টিফেন সেক্লুক্কা মন্তব্য করেছিলেন, 'স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানের চারপাশে চীনের সামরিক মহড়া প্রত্যাশিত হলেও উদ্বেগজনক।' মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের উপ-কমান্ডার সেক্লুক্কা ক্যানবেরায় সাংবাদিক ও উপস্থিত জনতাকে এও বলেন, 'সত্য বলতে, এরকম কিছু হবে, এটাই আমরা প্রত্যাশা করছিলাম।' যাইহোক, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীনের এই আগ্রাসন নীতি দক্ষিণ এশিয়ার জন্য খুবই উদ্বেগজনক এবং ভারতের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনকও বটে। □

রাষ্ট্র-চেতনা বিরোধীরা সর্প গরলের চেয়েও মারাত্মক

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

অবনীন্দ্র ঠাকুরের ক্ষীরের পুতুল আর একবার পড়লে কেমন হয়। ছোটরানি (সুয়োরানি) হিংসুটে। পাজি। বড়ো রানিকে (দুয়োরানি) মারতে চায়। মাঝে এল ব্রাহ্মণী, সুয়োরানির আজ্ঞাবহ দাসী। দুয়োরানিকে বিষ খাইয়ে মারতেই হবে। সে অনেক বড়ো কাজ। তারপর গেল বনে বনে, ঝোপে। ঘুমন্ত সাপকে বশ করলো মন্ত্রে। তার মুখ থেকে কালকুট বিষ আনলো সুয়োরানির কাছে। সেই বিষ দিয়ে তৈরি হল নাড়ু, মুগের সাঁচ, মোতিচুর মিঠাই। বিষ মিষ্টির ডালি গেল দুয়োরানির কাছে। রানি মহানন্দে খেল। তারপর... বুক জ্বলছে। গলা কাঠ। রানি মূর্ছিত।

আমাদের জীবনে, হিন্দু সমাজে, বৃহত্তর মানব সমাজে এমন অনেক সুয়োরানি, অনেক ব্রাহ্মণী চুপিসারে আছে। তারা বিষ ঢালছে বার্তায়, চেতনে, বিকৃত ইতিহাসে, ন্যারেটিভে, মননে, প্রবৃত্ত বুদ্ধিতে, যুবসমাজের উৎসাহে, রাষ্ট্রবোধে। জাতীয়তাবোধ যদি কখনো সশব্দে বিলাপ করে তাতেও তারা রাজনৈতিক ধ্বনি তোলে। তাদের ধ্বনির রসদ আসে কখনো চীন থেকে, কখনো-বা আইএসআই -এর থেকে, কখনো ইসলামিক কুখ্যাত সংগঠন থেকে। কখনো তা আসে ভারতের অতিবুদ্ধিজীবী মহল থেকে যারা অধিকাংশ হৃদয়ভাবে আল্ট্রাসেকুলার। সব থেকে মারাত্মক বিষধর হলো সেই সম্প্রদায় যারা মনস্তাত্ত্বিক বিষপ্রয়োগ করছে প্রতিনিয়ত। হিন্দুত্বকে ছোটো করার মধ্যে যারা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে— তাদের চাইতে বিষাক্ত মানব মেধা, প্রজাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। যাদের বলি কালচারাল মার্ক্সিস্ট। যারা সারাক্ষণ মননে পোষণ করছে প্রশাসন একটা শোষণ যন্ত্র। যারা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দেখলেই তাকে ফ্যাসিস্ট বলে। চিলির পিনোচেত, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো কিংবা জার্মানির হিটলারের সঙ্গে সমকক্ষে রাখে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে। এই ভণ্ড, স্বঘোষিত, সমাজতান্ত্রিক জীব সম্প্রদায় বড়োই বিপজ্জনক কেবল হিন্দুর জন্যই নয়। সামগ্রিক সমাজ ও প্রশাসনের জন্য। এদের বিষফণার ইন্ধনেই তৈরি হয় আর্বান নকশাল। কালচারাল মার্ক্সিস্ট বলছি বলে বিষাক্ত ফণা ফোঁস করছে এতক্ষণে। ফুঁসে উঠে বলছে— রক্ষণশীল কলম। কিন্তু এই কালচারাল মার্ক্সিস্ট এতটাই মারাত্মক যে তার বিষক্রিয়ার বিষয়ে এখানেই বলছি এমন নয়। বিশ্বব্যাপী এদের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সতর্ক ও ওয়াকিবহাল। আন্তোনিও গ্রামসি এমনকী ফ্রাঙ্কফুট স্কুল সরব হয়েছিল এই কালচারাল মার্ক্সিস্টের বিরুদ্ধে। একটা দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা যারা গণতন্ত্রের নামে ভাঙতে চায়। যারা সংখ্যালঘু শব্দের কোলাহলে দিনের পর দিন তাদের মোল্লাবাদের সেবা করে তারা বিষাক্ত সভ্যতার কারিগর। ধীরে ধীরে স্নায়ু ইন্দ্রিয়ে তারা জাতীয়তাবোধে অসারতা আনে। যেমন আনন্দ তেলতুম্বে। ২০১৮ সালে রিপাবলিক অফ দ্য কাস্ট প্রকাশ করলেন, উগরে দিলেন বিভ্রান্তির গরল। যারা সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিমত্তার কসরত করছে, তাদের বুদ্ধি স্বাস্থ্যে অপশক্তির ছায়া খনন করতে এই বই যথেষ্ট। তিনি তার স্যাফ্রোনাইজিং : 'আম্বেদকর দ্য আরএসএস ইনভারসন অফ দ্য আইডিয়া'-তে যে ভাবে হিন্দুত্বের ওপর আঁচড় দিয়েছেন তা যে কোনো পাঠক যুবকের মনস্তাত্ত্বিক কুপ্রভাব ফেলতে সক্ষম। যদি না তিনি বিপরীত পন্থার মতাদর্শও পাঠের ধৈর্য ও ইচ্ছা রাখেন। অতি সক্রিয় স্বঘোষিত এহেন মানবাধিকার কর্মী যারা স্যাফ্রন টেররিজমের প্রোপাগান্ডা করে, তারাতো দলিতের জন্য সদা বিহ্বল। তথাপিও তদানীন্তন সরসঙ্ঘচালক মধুকর দত্তাত্রেয় ওরফে বালাসাহেব দেওরসকে স্যাফরন টেররিস্ট বলতে পারেন কিন্তু বলে না, কারণ দলিতের মধ্যে সক্রিয় কাজ কমিউনিস্টদের আগে তিনিই করেন। নীতির বিভেদ থাকলেই তাতে বিচ্ছিন্নবাদ, দুরারোগ্য ব্যাধি যোগ করার কালচার কমিউনিস্ট ভাবধারা আনলো। ইসলামিক তরবারি আগ্রাসনের চাইতেও এ আরও মারাত্মক, কারণ এই বিষ অদৃশ্য। সেকুলারবাদ আছে বলেই ভারতের বুকে মোল্লাবাদ তার প্রভাব বিস্তার করতে পারছে। খ্রিস্টান মিশনারি দলিত অধ্যুষিত অঞ্চলে স্কুল গড়েছে, মোল্লাবাদী খারিফ মাদ্রাসার নামে উগ্রবাদের শিক্ষা জিহাদের পাঠ করাচ্ছে। তা তাও প্রকাশ্য বিষময় কর্মকাণ্ড। এদের প্রচ্ছন্ন মদত দেয় সেকুলারিজমের বিষ দাওয়াই। হিন্দু সমাজের সচেতনতা সচেষ্টতাকে সাপের শীতঘুমে রাখে সেকুলারবাদ।

জাতিকে স্লোগান শিখিয়েও কূপমণ্ডুক তৈরি করার নাম সাংস্কৃতিক বিষক্রিয়া। এর ধর্মীয় বিষক্রিয়ার ফলে ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। তাই ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই গরলপাত্র তার অণু-পরমাণু সর্বত্র বিস্তার করেছে। তাকে নানাভাবে লালিতপালিত করেছে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সেকুলার বুদ্ধিমত্তাকারীরা।

ব্যক্তি সংকটের নিরিখে যেদিন সমরেশ বসু কমিউনিস্ট নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের মতাদর্শে বিভোর হয়ে সাম্যবাদী চেতনার কলম ধরলেন, তাতে মানবিক ছায়া ছিল। কিন্তু আজকের সংযোজনে যখন ভারভারা রাও-রা এল, তারা কী দিল সমাজকে? দেশকে? রাষ্ট্র শোষণ যন্ত্র বলতে বলতেই তারা রাষ্ট্র ষড়যন্ত্রের খলনায়ক হয়ে যায়। দেশদ্রোহিতা

আর মত বিরোধের সীমারেখা মুছে যে পরাবিপ্লবের ভাবপ্রকাশ চলে বিভিন্নভাবে তা যথার্থ রূপে কাউকেই বাঁচার রসদ দেয় না। আরবান নকশাল কোনো সাধারণ বিদ্বেষী শব্দ নয়। এ এক বিষাক্ত চেতনা, বিষাক্ত মতাদর্শ। যা মত বিরোধে থেমে থাকে না, যা রাষ্ট্রনীতির বিরোধ করে।

কমিউনিস্ট সেকুলার ও লিবার‍্যালবাদীরা এক কথায় যে অপপ্রচেষ্টা নানান ভাবে করছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশের হিন্দু মেজরেটেরিয়ানিজমকে নিপাত যাক বলা। হিন্দুত্ব কখনো গ্রুপ রাইটস, ভিন্ন ধর্মের অধিকার, অভ্যাসে মাথা গলায় না। কিন্তু অসংখ্য হিন্দু বিরোধী রাজনৈতিক দলনেতার বক্তব্য প্রচার নেহরু আমল থেকে এদেশের চার্চিল মতাদর্শের গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দেয়, যা আদতে ইসলামকে অতিরিক্ত মান্য করে। যদি বৃহত্তম সমাজের দিকে তাকাই, অসংখ্য সামাজিক বদভ্যাস যেভাবে সাধারণ অভ্যাস ব্যাধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাও তো এক রকম বিষক্রিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার নামান্তর! মেধা বিক্রি, দুর্নীতিকে শয়নকক্ষে যত্নে লালন করা, দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনীতিক ও চৌর্যবৃত্তি সার্থক হওয়া, প্রত্যেক স্তরে অতিরিক্ত রাজনীতিকরণ, বাড়বাড়ন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি তালিকা, আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদাহীন যুবসমাজ, পরিকল্পনাবোধহীন জীবন কাঠামো, ক্ষণিক জাগতিক সুখে মগ্ন থাকা অধিকাংশ মানুষের আগ্রহ এসব অগণিত বিবর্তিত বদভ্যাস ঢিমে তালে আমাদেরই মধ্যে অনেক পরিচিত হয়েছে। যে ক্ষতি হচ্ছে তার পূরণ হঠাৎ করে একটা দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক দল সরে গেল আর অন্য এক রাজনৈতিক দল রাজ্যে ক্ষমতায় এলেই হবে না। ক্ষীরের পুতুলের দুয়োরানির বিষক্রিয়া কাটতে তার আদরের বানরকে অনেক কসরত করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রেও যেন তাইই।

আশপাশের বিষধর মানুষকেও তো শনাক্ত করা যায় না। সমাজে দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত হলেই ভণ্ডামির প্রকোপ বাড়ে। ব্যক্তি জীবনে, ব্যক্তি সম্পর্কে ঠিক-ভুলের সংজ্ঞা সত্যিই কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। কিন্তু সত্যি-মিথ্যা তো ধ্রুব নির্দিষ্ট। লাভ জিহাদ, ব্যক্তি সম্পর্কে ষড়যন্ত্র, অকারণ ব্যক্তিস্তরে জটিলতা হেতু সংকটের তলানিতে নিমজ্জিত জীবন। যার ফলে হতাশা, নেশাপ্রবণতা, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, আত্মহননের প্রবণতা— এসব কিছুই বিন্দু বিন্দু বিষ প্রভাব, নিঃশব্দ বিষ নিঃশ্বাস। মুল্যবোধের সিঁড়িতে পদক্ষেপ যখন নামে তখন সে টের পায় না তার অভ্যাস গরল না অমৃত।

আমাদের সামাজিক সম্পর্কের অভ্যাসে আরও এক বিষাক্ত প্রভাব ফেলেছে অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তি। সোশ্যাল মিডিয়া এবং মোবাইল ফোনে আসক্তি ক্রাইম জোনের অনেক কাছে টেনে আনছে আসক্ত মানুষকে। আমরা ভাবছি এতে আর কী এমন ক্ষতি! কিন্তু যে ক্ষতি হচ্ছে তা বর্ণনা করতে গেলে মনে পড়ছে জেমস ক্লিরের অ্যাটমিক হ্যাবিটের প্রসঙ্গ। রোজ একটু একটু করে চর্চা হচ্ছে মন্দ অভ্যাসের। স্লো পয়েজনিং। তার পর অনেকগুলো বছর পর, সময় পেরিয়ে তার অভিঘাত ধরা পড়ে। ধরা পড়ে দেহে, মনে, সমাজে। বিষ যখন ক্রিয়া করে জৈবিক ভাবে সেও তো আণবিক অংশেই ক্রিয়া করে। আমাদের সমাজে ব্যক্তি অভ্যাসে, রাজনৈতিক অভ্যাসে, রুচিতেও যত কুঅভ্যাস তাও প্রতিস্থাপিত হয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঠিক যে জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে সর্প বিষ কার্যকর হয়— একই পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীল হয় মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ ধ্বংসী বিষ প্রভাব। জাত পাত, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, কুপ্রথা, মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতা এসবেও নিমজ্জিত সমাজের বড়ো অংশের মানুষ। তাদের নিমজ্জিত থাকার জন্য আহ্বান জানায় কিছু সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী। কিছু মানুষ আজকেও মনে করে দেবদাসী প্রথাটা থাকার বড্ড দরকার। চেতনার এই অলজ্জিত দশাও এরকম গরলাধীন সভ্যতার অংশ। ওরা ওই গরল থেকে মুক্ত নয়। তখন কী যুক্তি দেবে কালচারাল মার্ক্সিস্টরা? নিবন্ধের শেষে আবাব প্রশ্ন কমিউনিস্টদের জন্যই। সমাজের নানান প্রথার গরল কেন ওরা ওঝার মতো দূর করতে পারেনি। কেন আজকেও এক একটা ব্যাধির সুরাহার জন্য সরকারকে মাথা গলাতে হচ্ছে। নীতি নির্ধারণ করতে হচ্ছে। তার কারণ, কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসি সোশ্যালিস্ট মডেল নিজেরাই নৈতিকভাবে অবক্ষয়িত। কমিউনিস্ট নেতা শিবদাস ঘোষ স্বয়ং বলেছিলেন, একদল মানুষ এই শোষণ বদলাতেই চায় না। যারা পুঁজিবাদের বিরোধ করে চলছে তারা চিরকাল করবে, অনৈতিক অনৈতিক বলে কিন্তু তারা সুবিধাটাও ভোগ করবে। শিবদাস ঘোষ সরষের মধ্যে ভূতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই ভূতরূপ বিষপাত্র ধরে রেখেছে নানান প্রক্রিয়ায়। চিন্তায়, ঐতিহ্যে, ইতিহাসে এরা বিকৃতি আনে। জাতিকে স্লোগান শিখিয়েও কূপমণ্ডুক তৈরি করার নাম সাংস্কৃতিক বিষক্রিয়া। এর ধর্মীয় বিষক্রিয়ার ফলে ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে। তাই ভারতের স্বাধীনতার পর থেকেই গরলপাত্র তার অণু-পরমাণু সর্বত্র বিস্তার করেছে। তাকে নানাভাবে লালিত পালিত করেছে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সেকুলার বুদ্ধিমত্তাকারীরা।

এই শিবদাস ঘোষ একদিন এক অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। তা হলো 'ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদী'। ওরা নাকি ওত পেতে বসে আছে বামপন্থীদের প্রতি। ওই শব্দ থেকেই আরও একবার স্পষ্ট হয়, রাষ্ট্রবাদী শব্দে তাদের কতটা আপত্তি বিরক্তি থাকলে তার সঙ্গে ধর্মীয় শব্দের কোলাকুলি করান। কারণ? হিন্দুত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রতত্ত্ব অসম্ভব, অবাস্তব তাই। যে সৎ কমিউনিস্ট তাঁর রচিত বইতে এমন শব্দ ব্যাখ্যা করে আর্কাইভ্যাল ভ্যালু তৈরির কাজ করেন তারা কেন মনন মলিকিউলে বিষ ঢালে তা কী আর বুঝতে বাকি থাকে! তবে হ্যা, এই 'ধর্মীয় রাষ্ট্রবাদীরাই ক্ষীরের পুতুলের বানরের মতো। এরা আছে বলেই নাটকের বানরের মতো বিষক্রিয়া কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। নাটকে সেদিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুয়োরানির জয় দেখেছিলেন। দুয়োরানি শুধু বেঁচেই ফেরেননি, ক্ষীরের পুতুল রাজা বানর আর ছিল রাজকলরোল। সুয়োরানির লজ্জার শেষ নেই। ছিঃ ছিঃ, অপরাধ ধরা পড়ে গেছে! যারা সুয়োরানির ভূমিকাতে, দিব্যদৃষ্টি হারিয়েছে বলেই বিষ নিঃশ্বাস ফেলছে আনাচে কানাচে। কিন্তু 'গল্প শেষের ভোরে' রাজ্য শান্তি পায়, ভালো রাজা আর বানর মন্ত্রী হয়। বিষক্রিয়াও কাটে। কারণ রাষ্ট্রবাদী শক্তি অ্যান্টিভেনম। ▯

গণপিটুনির রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে শুধু রামভক্তরা নয় চরম মূল্য চুকাচ্ছে উদারপন্থী মুসলমানরাও

সাধন কুমার পাল

কোচবিহার জেলায় মাথাভাঙ্গা মহকুমার বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত রুইডাঙ্গা অঞ্চলের রাঙ্গামাটি গ্রামে ভোট পরবর্তী এক নিকৃষ্টতম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হলো শামিমা বেগমকে (নাম পরিবর্তীত), যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। তিনি কোচবিহার জেলা বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা কমিটির সদস্যা। মুসলমান হওয়ায় বিজেপি দল করা যাবে না এই ফতোয়া ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। গত ৪ মে লোকসভার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের কর্মীরা ফতোয়া জারি করেছিল বাড়ি থেকে বেরোলেই শামিমা বেগমকে দেখে নেওয়া হবে। মহিলার অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ফলে এই গৃহবন্দি অবস্থায় স্থানীয় বিজেপির কর্মীরাই তাকে খাবার ও অন্যান্য রসদ দিয়ে বাড়িতে থাকার জন্য সাহায্য করে আসছিলেন। পাশাপাশি এটাও বলে আসছিলেন কিছুদিন পরে হয়তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

অবশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে ধরে নিয়ে অনেকটা নিরুপায় হয়েই ২৫ জুন, তিনি বেরিয়েছিলেন জমির কাজে মানসাই নদীর চরে। কিন্তু মাঝ রাস্তায় পথ আটকায় স্থানীয় কয়েকজন মহিলা। ওরা বলছিল 'তোর আজকে বিজেপি করার শখ মেটাবো'। এই বলতে না বলতে ওই মহিলাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হেঁচড়ে দূরে নিয়ে যায় এবং বেদম প্রহার করতে শুরু করে। ওদের মধ্যে একজন ওই মহিলার পরনের সমস্ত কাপড় খুলে নেয় এবং ওই কাপড় নদীতে ফেলে দেয়। ঘটনার খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল ওই মারমুখি মহিলাদের স্বামী এবং ওই গ্রামেরই অনেক মহিলা। শামিমা বেগমকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করার সময় মহিলারা বারবার বলছিল তোকে আজকে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষগুলোকে দিয়েই ধর্ষণ করাবো। তাদের মধ্যে কেউ শামিমা বেগমকে বাঁচাতে চাইলে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষেরা বলতে থাকে ওকে যেই বাঁচাতে চাইবে তাদেরও এ রকমেরই পরিণতি হবে।

তাই কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। অত্যাচারিতা মহিলা বিবস্ত্র অবস্থায় প্রায় এক কিলোমিটার দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে উঠোনে পড়ে যায়। পাশের বাড়িতে থাকা তার মা একটি কাপড় তার উপর ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপর তৃণমূলের লোকজন রাস্তার দুদিকে বেরোনোর পথ আটকে রাখে যাতে ওই মহিলাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারে। স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা সমস্ত ঘটনার মোবাইলে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করলেও কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। শামিমা বেগমের একটাই অপরাধ ছিল তিনি কেন মুসলমান হয়ে বিজেপি করবেন! এরপর বিজেপির মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃত্ব ঘটনার খবর পেলে পুলিশে খবর দেয়। ১ ঘণ্টারও বেশি দেরিতে এসে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয় সূত্র বলছে, পুলিশ পৌঁছেই সবার আগে সেই সব মোবাইল নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয় যেগুলোতে ভিডিয়ো করা হয়েছিল এবং ছবি তোলা হয়েছিল। নগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকা একটি ছবি পাওয়া গেছে যেটি সেইসব মোবাইল থেকে অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছিল এবং

সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সেই ছবি সবাই দেখেছেও। পুলিশ মোবাইল না নিলে চোপড়ার ঘটনার মতো রাঙ্গামাটির বর্বরোচিত ঘটনাও বিশ্ববাসী দেখতে পেত।

এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত হলে পুলিশকেও অবশ্যই তদন্তের আওতায় আনা উচিত, যারা কিনা ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের উপস্থিতিতে কোনোরকমে একটি টোটো ভাড়া করে নির্যাতিতা মহিলার বাবা স্থানীয় দুজনকে নিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা হাসপাতালে পৌঁছান চিকিৎসার জন্য। ঘোকসাডাঙ্গা হাসপাতাল রেফার করে দেয় কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও দুদিন পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই মহিলাকে ছুটি দেয়। এরপর ওই মহিলা আশ্রয় নেয় কোচবিহার জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। ওই মহিলার বাবার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নামমাত্র তদন্তে জানিয়ে দেয় এই ঘটনা পারিবারিক। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ৩০ জুন মহিলার বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন করে জেলা কার্যালয়ে পৌঁছে বিবৃতি দেয় এই ঘটনা পারিবারিক।

অর্থাৎ পুলিশ ও তৃণমূল নেতৃত্বের বিবৃতি একই রকমের। এই ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহার জেলা বিজেপি নেতৃত্ব তীব্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার সাত জনের একটি প্রতিনিধি দল তৈরি করে দেন এবং ওই নির্যাতিতা মহিলার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানতে নির্দেশ দেন। এই প্রতিনিধি দল-সহ কোচবিহার জেলা মহিলা মোর্চা ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। রাজ্যের পাঠানো প্রতিনিধিদলকে এসপি অফিসে ঢুকতে বাধা দিলে তারা রাস্তায় বসে আন্দোলন করতে থাকেন।

আন্দোলনের চাপে ঘটনার ৫ দিন পর কোচবিহার পুলিশ নির্যাতিতা মহিলার বয়ান রেকর্ড করে। দিল্লি থেকে ছুটে আসেন মহিলা কমিশনের এক সদস্যা। তিনি গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন এবং নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সমস্ত বিবরণ শোনেন। নির্যাতিতা মহিলার মায়ের মুখ থেকে বারবার বলতে শোনা যায় 'আমি শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। দোষীদের কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' এখানে উল্লেখ্য যে, মহিলা কমিশনের সদস্যার কাছে নির্যাতিতা মহিলা বারবার দাবি করেন গোটা ঘটনার সিবিআই তদন্ত হোক। তাহলেই সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। শামিমা বেগমের বড়ো পুত্র ও স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকে। আরেক পুত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র কিন্তু মায়ের এই নির্যাতনের পর থেকেই তারও স্কুলে যাতায়াত বন্ধ। প্রশ্ন হচ্ছে, এরপরে ও কোনোদিন স্কুলে যেতে পারবে? আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর নেই, কারণ ওর মা ভারতীয় জনতা পার্টি করে এক মহাপাপ করেছে!

এই ঘটনার পরদিন ২৬ জুন রামঠেঙ্গা বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে সেখানকার সহ শক্তিপ্রমুখ বঙ্কিম দেবসিংহকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূলের কর্মী। তাকে কাঠের বাটাম দিয়ে বেধড়ক প্রহার করে তার কাছ থেকে সঙ্গে থাকা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে প্রান্তিক চাষিরাও তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন— মনোরঞ্জন বর্মন, বিমল বর্মন, গজেন বর্মন, শ্যাম বর্মন, সুবোধ বিশ্বাস, ললিত বিশ্বাস, দয়াল বর্মন প্রত্যেকের তিন থেকে পাঁচ বিঘা জমিতে টিএমসি, ফ্ল্যাগ লাগিয়ে বেদখল করেছে। যার ফলে বর্ষাকালীন ধান চাষ-সহ অন্যান্য কোনো প্রকার ফসল উৎপাদন করতে পারছে না।

২০২১-এর নির্বাচনের পর যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স হয়েছিল সেখানটায় তৃণমূলের হার্মাদরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেহাদিরা দলবদ্ধভাবে বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘরে লুটপাট চালিয়েছে, প্রকাশ্য হত্যালীলা সংগঠিত করেছে। কিন্তু এবারে অত্যাচারের ধরনটা একটু অন্যরকম। প্রকাশ্যে বড়ো বড়ো ঘটনা ওরা এবার ঘটাচ্ছে না। এবার হাতে কম মারছে কিন্তু ভাতে মারার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করে গ্রামেগঞ্জে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কোথাও ফসল কাটতে দিচ্ছে না, কোথাও পুকুরের মাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও মোটা টাকা জরিমানা করেছে, কোথাও রেশন ছিনিয়ে নিচ্ছে, বাড়ির বাইরে বের হতে দিচ্ছে না। বেরোলেই প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে, কোথাও জোর করে জমিতে তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে সেগুলো দখল করে নিচ্ছে। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

এবার অত্যাচারের আরেকটা বিশেষ দিক দেখা যাচ্ছে, যার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে আগে তার নামে থানায় এফআইআর করে তারপর তাকে মারধর করা হচ্ছে। পুলিশ গিয়ে যে আক্রান্ত তাকেই গ্রেপ্তার করছে। অর্থাৎ সিপিএমের মাথাগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে এবার অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে বুথ অনুসারে। যে সমস্ত বুথে বিজেপি লিড পেয়েছে সেই সমস্ত বুথে যারা অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অক্ষত চাল বিতরণ করেছিল সেই সমস্ত সক্রিয় রামভক্ত হিন্দুদের উপর এই সমস্ত অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তাদেরকে গ্রামছাড়া করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কোন রাম এসে তোদের বাঁচায় এরকম সরাসরি অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হচ্ছে। বামেরা যেরকম নিখুঁত পরিকল্পনা করে বিরোধী নিধন যজ্ঞ চালাতো, ঠিক সেই চিত্র আবার ফিরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে।

এদিকে চোপড়ায় একটি ভয়ংকর ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের দিখলগাঁও গ্রামের। সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক নারী ও এক পুরুষকে হাত বেঁধে পেটানো হয়। দুজনেই রাস্তায় পড়েছিলেন। যুবকের দেহে শার্ট ছিল না। নারীর দেহে নাইটি ছিল। তাদের লাথিও

মারা হয়। ইরাক সিরিয়াতে ইসলামিক শাস্তি বলবৎ করার সময় চারদিকে উৎসুক জনতা যেমন দাঁড়িয়ে দেখে চোপড়ার ঘটনায় ঠিক তেমনভাবেই উৎসুক জনতা বিষয়টি দাঁড়িয়ে দেখছিল। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। এ ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূলের বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ তাজিমুল হক, এলাকায় যার নাম জেসিবি। বিরোধী দল ও গ্রামবাসীদের দাবি, তাজিমুল ওই গ্রামের তৃণমূল কোর কমিটির প্রধান এবং বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। তার জোরেই গ্রামে তার শাসন চলতো। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় এমএলএ হামিদুল ইসলাম জানিয়েছেন ইসলামিক রাজ্যে এটাই নাকি শাস্তির বিধান। তবে এখানটা নাকি একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। পুলিশ তাজিমুলকে গ্রেপ্তার করেছে। এক ব্যক্তি লুকিয়ে ওই ঘটনার ভিডিয়ো করেছেন। তিনি এখন গ্রামছাড়া বলে জানা গেছে।

তারিখটা ছিল ২১ মার্চ, ২০২২। বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। প্রতিশোধ নিতে ওইদিন রাতেই ভাদু অনুগামীরা ১২টি ঘরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় দশজনের। এই দশ জনের সকলেই মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত। কোথাও গুজবের জেরে, কোথাও চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। আর এতে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। ২৮, ২৯, ৩০ জুন তিন দিনে মোট ৫ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে।

৩০ জুন হুগলির তারকেশ্বরে নাইটা মাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবাঁধে গাড়িচালক ২৩ বছর বয়সি বিশ্বজিৎ মান্নাকে স্থানীয়রা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তাদের সন্দেহ— বিশ্বজিৎ গাড়ি চুরি করেছে। তবে পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় একটি পরিবারের বাবা, ছেলে ও তাদের কিছু বন্ধু মিলে বিশ্বজিৎকে বেধড়ক মারে। মারের চোটে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা রাত দুটো নাগাদ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ বাবা-ছেলে বিকাশ সামন্ত ও দেবকান্ত সামন্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে পাণ্ডুয়ায় মনসা পূজায় মাইক বাজানো নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এক যুবককে রাস্তায় ফেলে বাঁশ দিয়ে পেটানো হয়। তার রক্তবমি শুরু হয়। একদিনের মাথায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, ওই যুবক মাইক বাজানো নিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। মাইক বাজানো নিয়ে প্রতিবাদের জেরে তাকে বেধড়ক মারা হয়। মৃত যুবকের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন মৃতের স্ত্রী।

গত ২২ জুন ঝাড়গ্রামে চুরির সন্দেহে বেধড়ক মারের ফলে একজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বন্ধু অক্ষয়ের সঙ্গে সৌরভ সাউ স্কুটারে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেসময় তারা নির্মাণ সামগ্রী চুরি করেছে, এই অভিযোগে ব্যাপক পেটানো হয়। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সৌরভ পরে মারা যান। সৌরভের বাবা অবনী সাউ বলেন, 'ওরা দুই বন্ধু মিলে ঘুরতে বেরিয়েছিল। কিছু লোক ওদের চোর বলে ধাওয়া করে। প্রাণে বাঁচতে সৌরভ ও অক্ষয় পালানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। পুলিশ ফোন করে আমাকে ঘটনার কথা জানায়। ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে গিয়ে দেখি ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ।

কলকাতার বৌবাজারের ছাত্রাবাসে ইরশাদ নামে এক যুবককে মোবাইল চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তিনি চাঁদনীচক এলাকায় একটি দোকানে কাজ করতেন। তাকে ছাত্রাবাসে ধরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারা হয়। তিনি যেখানে কাজ করতেন, সেই মালিককে ফোন করেন। তিনি পুলিশে খবর দেন। কিন্তু ইরশাদকে বাঁচানো যায়নি।

সল্টলেকেও সম্প্রতি মোবাইল চোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তার আগে শিশুচুরির অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটিতে দুই নারীকে মারধর করা হয়েছে। ১ জুলাই দিনে দুপুরে বাসের মধ্যে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার অন্তর্গত ঘোকসাডাঙ্গা থানার নিকটবর্তী এলাকায়। সমস্ত ঘটনারই স্থান-কাল-পাত্র পৃথক হলেও প্রশ্ন কিন্তু উঠছেই, এই রাজ্য কি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে চরম অরাজকতার দিকে? □

With Best Compliments from -

A

Well wisher

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে গত এক বছরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, নির্যাতন, হামলা, বাড়ি ও জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৪৫টি। এসব ঘটনায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪৫ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ২০২৩ সালের জুলাই থেকে চলতি ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংঘটিত-নির্যাতন- নিপীড়ন নিয়ে গণমাধ্যমে আসা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরেছে। গত ৮ জুলাই রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক বছরে হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৪৫টি। মরদেহ উদ্ধার (হত্যাকাণ্ড বলে প্রতীয়মান) হয়েছে ৭ জনের। হত্যার চেষ্টা হয়েছে ১০ জনকে। হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৩৬ জনকে।

হামলা, শারীরিক নির্যাতন, জখম হয়েছেন ৪৭৯ জন। চাঁদা দাবি করা হয়েছে ১১ জনের কাছে। বসতঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১০২টি। বসতবাড়ি, জমিজমা দখলের ঘটনা ঘটেছে ৪৭টি। বসতবাড়ি, জমিজমা দখলের, উচ্ছেদের তৎপরতা ও হুমকির ঘটনা ঘটেছে ৪৫টি। দেশত্যাগের হুমকি, বাধ্য করার চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১১টি। দেবোত্তর, মন্দির, গির্জার সম্পত্তি দখল ও দখলের চেষ্টার ঘটনা হয়েছে ১৫টি। শ্মশানভূমি দখল, দখলের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ৭টি। মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১৪টি। প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে ৪০টি। দলবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ২৫টি। অপরহণ। নিখোঁজ ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছে ১২টি। ধর্ম অবমাননার কল্পিত অভিযোগে আটক হয়েছেন ৮ জন। সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় (জানুয়ারি ২০২৪) সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৩২টি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৫টি। এছাড়া অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে ১৪টি। মোট ঘটনা ১ হাজার ৪৫টি।

সাংবাদিক সম্মেলনে এসব ঘটনাকে আংশিকমাত্র বলে উল্লেখ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়,

সহিংসতার ঘটনার খুব বেশি হেরফের আজও হয়নি। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু ছিল প্রায় ১৯ শতাংশ। এখন তা ৮.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার পরিবেশ একেবারেই সংকুচিত করা হয়েছে। পুলিশি প্রহরায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান-উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় সন্ত্রাসীদের কাউকে জনগণ আটক করলে পুলিশ, প্রশাসন তাকে পাগল বানিয়ে ছেড়ে দেয়, এভাবে মূলত সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকেই উৎসাহিত করে।

সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ ভূমিকেন্দ্রিক বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, ভূমি জবরদখলের বদ মতলবে ভূমিখেকো সন্ত্রাসীরা প্রায় বেশিরভাগ সময় নানা রাজনৈতিক দলের প্রভাবপুষ্ট হয়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংস আক্রমণ পরিচালনা করছে। সরকারি সংস্থাও জমি জবরদখলের ঘৃণ্য কাজে জড়িত। রানা দাশগুপ্ত বলেন, সাম্প্রদায়িক ও মোল্লাবাদী অপশক্তি রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, রাজনীতি, সমাজ-সহ সর্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অধিকতর নিরাপত্তাহীন ও আস্থাহীন করে তুলছে। তাঁদের কৌশলে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন রোধে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন-সহ আওয়ামি লিগের ইশতেহারে থাকা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

গত এক বছরের অর্থাৎ জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালের চালচিত্র সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপনের আগে ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবরে দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন থেকে ওই বছরের ১ নভেম্বর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা তুলে ধরা হয়। ঐক্য পরিষদের পর্যবেক্ষণে সে সময়কালে মোট আক্রান্ত জেলার সংখ্যা ছিল ২৭, মোট আক্রান্ত মন্দির, পূজামণ্ডপ ছিল ১১৭টি, মোট আক্রান্ত বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩০১, নিহতের সংখ্যা ছিল ৫ জন (এছাড়া পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ৪ হামলাকারী)। এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরে সাত মাসের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের চালচিত্রে দেখা যায়, ওই সময়কালে হত্যার শিকার হয়েছেন ১৭ জন, হত্যাচেষ্টার শিকার হয়েছেন ১০ জন, হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ১১ জনকে, ধর্ষণের ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩০ জন, ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ৬ জনকে, শ্লীলতাহানির কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৩ জন, প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে ২৭টি, মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে

ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের সামনে সমবেত মহিলারা তাদের অসহায়তার কথা তুলে ধরছেন।

২৩টি, শ্মশান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে ৫টি, বসতভিটা, জমিজমা থেকে উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে ২৬টি, বসতভিটা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাটের ঘটনা ঘটে ৮৮টি, দৈহিক হামলায় গুরুতর জখম হন ২৪৭ জন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ত্রাণ বিতরণকালে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় ২০টি পরিবারকে, ইসলাম সম্পর্কে কটূক্তির মিথ্যা অভিযোগে আটক করা হয় ৪ জনকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ছিল এরকম : হত্যার শিকার হয়েছেন ৯৩ জন, বসতঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাটের ঘটনা ঘটেছে ৭০টি, চাঁদা দাবির ঘটনা ১টি, বসতবাড়ি, জমিজমা দখলের ঘটনা ঘটেছে ৩৬টি, বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ২৮টি চাকমা পরিবার, উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছে ১টি পরিবারকে, দেবোত্তর, মন্দির, গির্জায় হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৩৭টি, প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে ৮১টি, শ্মশান দখল, দখলের চেষ্টা হয়েছে ৫টি, অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ১১টি, জায়গাজমি থেকে উৎখাতের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১২৯টি, ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি, ধর্মীয় অনুভূতিতে কথিত আঘাতের ঘটনায় আটক হয়েছেন ৮ জন।

সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের চালচিত্র বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ করে সংখ্যালঘু স্বর্ণব্যবসায়ী ও তাদের পরিবার, মন্দির, উপাসনালয় ও বিগ্রহ, সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি ও স্কুল কলেজে পড়ুয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার পরিবেশ একেবারেই সংকুচিত করা হয়েছে। পুলিশ প্রহরায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলাকালে সন্ত্রাসীদের কাউকে জনগণ আটক করলে পুলিশ প্রশাসন তাকে 'পাগল' বানিয়ে মূলত সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকেই উৎসাহিত করে। ফেইসবুক হ্যাক করে ধর্ম অবমাননার কল্পিত অভিযোগে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িকে আক্রমণের শিকার করছে, অহেতুক যুবক সম্প্রদায়কে হয়রানি করছে। সংখালঘুদের ওপর সংহিংসতার ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ ভূমিকেন্দ্রিক। ভূমি জবরদখলের বদমতলবে ভূমিখেকো সন্ত্রাসীরা প্রায় বেশিরভাগ সময় নানান রাজনৈতিক দলের প্রভাবপুষ্ট হয়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংস আক্রমণ পরিচালনা করছে। সিটি কর্পোরেশনের মতো সরকারি সংস্থাও জমি জবরদখলের ঘৃণ্য কাজে জড়িত।

ঢাকায় অতি সম্প্রতিকালে বংশালের আগাসাদেক লেনের মিরনজিল্লা হরিজন পল্লী, যাত্রাবাড়ির ধলপুরের তেলুগু কলোনি এবং কমলাপুর রেল লাইনের পাশে হরিজন পল্লীর বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা না করে তাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের অপপ্রয়াসের দুঃখজনক ও অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের নেতাদের ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর অপপ্রয়াসও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে। শুধু তাই নয়, এ দুটি নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তারা মূলত শাসক দলের। কেউ দলীয় প্রতীকে, কেউ-বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। লক্ষ্য করা গেছে কিছু ব্যতিক্রমবাদে প্রার্থীদের অনেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভোটদানে নানানভাবে শুধু বিঘ্নই সৃষ্টি করেনি, প্রকারান্তরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এ বিভাজনের কারণে নির্বাচনের পক্ষ-বিপক্ষের হাতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন নির্বাচনে নতুন একমাত্রা যুক্ত করেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপামর বাঙ্গালি ও জনজাতি জনগোষ্ঠী একাকার হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, সীমাহীন আত্মত্যাগ করেছে। এরই মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভাব ঘটে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। ৭২-র সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সরকার পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষিত হয়। সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা' ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে রাষ্ট্রজীবনে ও রাজনৈতিক পর্যায়ে কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে তা বিশদভাবে উল্লেখিত ছিল। কিন্তু সংবিধানের এই যে সাংবিধানিক ধারা তার চর্চা ও প্রয়োগের সূচনা ঘটার মুহূর্তে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে খুদে পাকিস্তানে পরিণত করা হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশকে অধিকতর সাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে জারিকরা সামরিক আইনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানকে পাকিস্তানি সংবিধানের আলোকে ধর্মীয় মোড়কে আচ্ছাদিত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগণের ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে সংযোজিত করে বাঙ্গালি জাতিসত্তাকে ধর্মের ভিত্তিতে শুধু খণ্ডিত করা হয়নি, জনগণনার দিক থেকে সংখ্যালঘু ও জনজাতি এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এভাবে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়। প্রায় ২১ বছর সামরিক বেসামরিক নানান লেবাসে ক্ষমতা দখলকারী শক্তিসমূহ ১৯৭১ সালে পরাজিত শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা ও মোল্লাবাদকে ছড়িয়ে দেয়। বিগত ১৫ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসীন হওয়া সত্ত্বেও আজও সংবিধানকে ১৯৭২ সালের ধারায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়নি।

পঞ্চদশ সংশোধনীয় মধ্য দিয়ে বাতিলকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ সংবিধানে ফিরে এলেও সাম্প্রদায়িক আবরণ ও আভরণ থেকে সংবিধান মুক্ত হতে পারেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সঙ্গে মেলবন্ধন বা তোষণ কার্যত তাদের উৎসাহিত করেছে। এর ফলে বাঙ্গালিত্ব ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, আত্মপরিচয়ের সংকট তীব্রতর হচ্ছে, সংস্কৃতিতে সংকট চলছে। এ সুযোগে সাম্প্রদায়িক ও মোল্লাবাদী অপশক্তি, সরকার, প্রশাসন, রাজনীতি, সমাজ-সহ সর্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অধিকতর নিরাপত্তাহীন ও আস্থাহীন করে তুলছে এবং তাদের দেশত্যাগকে কৌশলে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও আজও তা কার্যকর হতে পারেনি এবং এর মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখা হয়েছে, যা উদ্বেজনক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০১ সালে তথাকথিত শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিল করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন সংসদে গৃহীত হলেও বাস্তবায়নের মুখ দেখতে পারেনি। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘাপটি মেরে থাকা সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও জনজাতিদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে দেয়নি। বরং নানান আছিলায় সংখালঘুদের হয়রানি ও সর্বস্বান্ত করে তুলেছে। অব্যাহত সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন ও আইনের প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে কার্যত সংখ্যালঘুদের ভূমিহীন করার এহেন দুষ্ট অভিসন্ধি একদিকে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যদিকে দেশের গণতান্ত্রিক ভিতকে ক্রমশই দুর্বল করে দিচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, এহেন পরিস্থিতিতে ঐক্য পরিষদের দাবি অনুযায়ী শাসক দল আওয়ামি লিগ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বেশকিছু সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব অঙ্গীকার করে। যদিও এ অঙ্গীকারসমূহের বেশিরভাগই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও শাসক দল ত্যাগের নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তার কোনোটিই বাস্তবায়ন করা হয়নি।

আওয়ামি লিগের নির্বাচনী অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে রয়েছে--- (ক) সংবিধানের ২৩ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিতত্ত্বা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের' ধারা সুরক্ষার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা; (খ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন প্রয়োগের বাধা দূর করা; (গ) জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এবং সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন; (ঘ) বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের 'এথনিক ক্লিনজিং' অপনীতির কবলে যে সব অমানবিক ঘটনা ঘটেছে (২০০১-২০০৬ পর্যন্ত) তার বিচারকার্য সম্পন্ন করা এবং তার পুনরাবৃত্তি বোধ; (ঙ) ধর্মীয় সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, জীবন সম্পদ সম্ভ্রম মান-মর্যাদা সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করা; (চ) দেশের সকল অনগ্রসর অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন এবং ওইসব অঞ্চলের জনগণের জীবনের মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান। □

হিন্দুদের ভোটেই পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসবে

গত ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের ফলাফল থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসন পরিবর্তনের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ভোট দেবেন না। কারণ তারা বর্তমান শাসকের ভোটব্যাংক। তারা ভালো করেই জানেন বর্তমান শাসক তাদের মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করে। পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি আছে শত অন্যায়, অবৈধ কাজ করলেও ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। এমনকী ওদের কোনো কাজে বাধাও দেওয়া যাবে না। তাই ওরা একপ্রকার নিশ্চিত যে বর্তমান শাসকের পশ্চিমবঙ্গ তাদের স্বর্গরাজ্য। আর তারা বর্তমান শাসকের পক্ষে প্রায় ৯১ শতাংশ ভোট দিয়েছিলেন গত বিধানসভায়। তৃণমূল কংগ্রেস ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তার ২৮-৩৯ শতাংশ ভোট মুসলমান ভোট। আর বাকি লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ১০ শতাংশ ভোট ও ৫ শতাংশ অন্যান্য। কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কিন্তু বর্তমান শাসকের পক্ষে নেই। তা সত্ত্বেও লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হলো। তাতে ১০০০ টাকা হাতে দিয়ে রাজ্যের মহিলা ভোটারের ১০-১২ শতাংশ কিনে নেওয়া হলো। তারা ভুলে গেলেন শাসকের দুর্নীতি, যোগ্য মেধার চাকরি নেই, যুব সমাজের হাতে ২৮ টাকার পাউচ, লটারির টিকিট, সবকিছু। তাই এই লোকসভা ভোটে শাসকের ৪৬ শতাংশ ভোটের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট ও ১২ শতাংশ লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভোট, বাকি অন্যান্য। এবারের লোকসভা ভোটে মুসলমান ভোটের পুরোটাই বর্তমান শাসকের ঘরে গিয়েছে। হিন্দুরা ভোট দিয়েছেন ৬০-৬৫ শতাংশ সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ভোট দিয়েছে ৯০-৯৫ শতাংশ। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও হিন্দুরা পিছিয়ে আছেন। একদিকে ভালো হয়েছে বিরোধীদল ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন লোকসভায় যার পুরোটাই সচেতন হিন্দুদের ভোট। যা গত বিধানসভা ভোটের থেকে ১ শতাংশ ভোট বেড়েছে এবং শহরাঞ্চলের সচেতন অধিকাংশ মানুষই বিরোধী দলকে ভোট দিয়েছেন। মোটামুটি ১০০টি বিধান সভার আসনে বিরোধী দল এগিয়ে রয়েছে, তাই হতাশ হওয়ার কোনো জায়গা নেই। লোকসভায় আসন কিছু কমলেও ভোট কমেনি। বঙ্গ বিজেপি এই লোকসভা থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি বুথ স্তরে যদি সংগঠনকে মজবুত করে তোলে তাহলে সামনের ২০২৬ সালে হিন্দু ভোটেই রাজ্যের পরিবর্তন সম্ভব।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

উইকিলিকসের তরফে সাম্প্রতিক ভারতীয় কালো টাকার তথ্য ফাঁস একটি ফেক নিউজ

গত ৮ জুলাই দেশ জুড়ে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয় একটি ভুয়ো খবর। সেই খবরে দাবি করা হয় যে উইকিলিকস্ নামক সংস্থার তরফে ইংল্যান্ডের কয়েকটি ব্যাংক ও সুইস ব্যাংকে বহু নামজাদা ভারতীয় রাজনীতিকের কালো টাকা গচ্ছিত রয়েছে। এই খবরে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির ২৪ জন বড়ো মাপের নেতার নামও উল্লেখ করা হয় যারা নানা ভাবে বিদেশে কালো টাকা গচ্ছিত রেখেছেন। উইকিলিকসের ওয়েবসাইটে বা ইন্টারনেটের অন্য কোনো ওয়েবসাইটে যদিও এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য নেই। তথ্য যাচাইয়ের পর এটা স্পষ্ট যে কতিপয় বিজেপি নেতাকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যেই এই ভাইরাল পোস্টের অবতারণা। সদ্য নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকার ও এনডিএ-র নেতৃত্বকে বিড়ম্বনায় ফেলতে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর পরিকল্পনায় সম্প্রতি নানাভাবে সংসদ অচল করার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে বিরোধী দলগুলি। গঠনমূলক সমালোচনা ও বিতর্কের পথে হাঁটার ক্ষমতা তাদের নেই। রাষ্ট্রপতি ভাষণের ওপর তাঁর জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যখন সংসদে বক্তব্য রাখছিলেন, তখন লোকসভায় বিরোধী পক্ষের তরফে ২০ জন করে সাংসদকে নিয়ে একাধিক টিম গঠন করা হয়। একটি করে টিম প্রতি মুহূর্তে ট্রেজারি বেঞ্চকে উদ্দেশ্য করে অসংসদীয়, অশোভন ও ব্যঙ্গাত্মক উক্তি ছুঁড়ে দিতে থাকে। সব শেষে বলার কিছু না থাকলে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেওয়া শুরু হয়। একটি টিম ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্য আরেকটি টিম সেই একই খেলা শুরু করে। তাদের লক্ষ্যই ছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা চলাকালীন যেনতেনপ্রকারেণ বাধাদান। তাদের তরফে প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করেননি। তাঁর ভাষণ চলাকালীন বিরোধী জোটের তরফে যেসব কথাবার্তা ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তা লোকসভার রেকর্ডে স্থান পাবে না জানান স্পিকার। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের আগে বর্তমান বিরোধী দলনেতা তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে চূড়ান্ত অসংসদীয় কায়দায় আক্রমণ শানিয়েছিলেন এবং সংসদে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নাকি হিন্দু নন। সেই ঘটনাগুলির পর সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ফেক নিউজ জনসমাজে বার্তা দিচ্ছে যে চরিত্রহীন, দেশদ্রোহী, কুচক্রী বিরোধী দলগুলির কার্যকলাপ থেকে দেশবাসীর সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে।

—**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,**
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।

হিন্দুসমাজকে সচেতন হতে হবে

অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস

চারিদিকে শুধু হীমন্মন্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বজাতিবৈরিতা, দাসত্বসুলভ মনোভাব! এই জাতিকে কে রক্ষা করবে? এক এক করে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কয়েকশো বছরের পরাধীনতা, বৈদেশিক, আক্রমণ, নারীদের উপর অত্যাচার, খুন-জখম, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, হয় ইসলাম না হয় মৃত্যু! অন্ধকারময় মধ্যযুগ অতিক্রম করে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে হিন্দুরা সারা ভারতবর্ষে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে— এমতাবস্থায় সঙ্কুচিত, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা হিন্দুরা যখন ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষে প্রবেশ করল ইংরেজরা বণিকের ছদ্মবেশে। বাণিজ্যের নামে স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ইংরেজরা গ্রাস করতে শুরু করল ভারতবর্ষকে। একটা সময় সারা ভারতবর্ষ ইংরেজদের আয়ত্তে চলে আসে। ভারতবর্ষকে পদানত করে শাসন করতে শুরু করল তারা।

দেশভাগ ও ভারতের স্বাধীনতালাভের পরবর্তী পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্গালিরা উর্দুভাষা চাপিয়ে দেওয়া মেনে নিতে পারলেন না। তারা বাংলাভাষার দাবিতে তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। তখন পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি পাকিস্তানের সংসদে দাঁড়িয়ে তীব্র ভাষায় উর্দুভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ জানান। পূর্ববঙ্গে তিনি তীব্র গণআন্দোলন সংগঠিত করেন। পূর্ববঙ্গে মুজিবুর রহমান তখন উঠতি নেতা। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গভাষীরা স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করে তুলেছেন। ১৯৭০-৭১ সালে খানসেনারা প্রথমেই ভাষা আন্দোলনের জনক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। তার পরিবারকে তছনছ করে দিল। বেছে বেছে বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারগুলোকে অত্যাচারে জর্জরিত করে ধ্বংস করে দিল। কত মা-বোনের যে ইজ্জত হানি করল, কত যে হত্যা করল— তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমরা কি দেখি! ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের নায়ক কে— বরকত ও আরও কত ইসলামি ভাই। এছাড়াও অসমের বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে প্রাণ দিয়েছেন আরও কতজন। কিন্তু তাঁদের কথা ভুলেও স্মরণ করা হয় না। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাভাষা আন্দোলনের জনক হিসেবে প্রচার করা হয়, প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় শুধুমাত্র বরকতদের নাম। শুধুমাত্র মুসলমান বলে নয় কি? অধুনা বাংলাদেশে ধীরেনবাবুর নাম কেউ স্মরণ করে না। ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখে প্রতিনিয়ত দুঃখ পেতে হয়। একটু চেষ্টা করলে হিন্দু সমাজের ব্যাধি নির্মূল করা যেতে পারে। আমরা ভাবি, হিন্দুরা সবসময় হিন্দুদের পাশে থাকবেন— তা ঠিক নয়, এতটা আশা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে যে লাভজেহাদের সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে— সেটা বন্ধ করা খুবই কঠিন। কেননা আমাদের সমাজের মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কথা শুনতে প্রস্তুত নয়— সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা। তাছাড়া হিন্দু যুবকরা অধিকাংশই বিবাহবিমুখ (অর্থনৈতিক কারণে)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করা দরকার।

খবরের কাগজে একদিন পড়লাম, বাগুইহাটিতে প্র্যাকটিস করতেন একজন মুসলমান ডাক্তার— যিনি আদপে কোয়াক ডাক্তার, হিন্দু নাম নিয়ে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মিশে থাকতেন এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তার আসল বাড়ি ছিল বসিরহাটের দিকে। হিন্দু মেয়েটি যখন জানতে পারল, থানায় অভিযোগ করল। এর ফলে খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হলো, এরকম হাজার হাজার ঘটছে ভারতে। এটা লাভজেহাদ নয়তো কী! সম্প্রতি জানা গেল কর্ণাটকের এক কংগ্রেস নেতার মেয়ের সঙ্গে এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং ভদ্রলোক সরাসরি এটা 'লাভজেহাদ' বলে অভিযোগ করেছেন।

সমাজের একজন প্রবীণ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষিত ও সচেতন মানুষকে বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে এবং আগামীদিনে হিন্দু তরুণীদের বিধর্মীদের হাতে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা জানি, একটি শিক্ষিতা ও সাবালিকা মেয়ের অধিকার আছে— নিজের স্বাধীন মনোভাব নিয়ে জীবনযাপন করার। কিন্তু জানে না— যদি একবার ভুল করে তারা মুসলমান পরিবারে চলে যায়— তাদের জীবনের সাধ-আহ্লাদ- ভবিষ্যৎ সব শেষ হয়ে যাবে। কেননা মুসলমানরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা মেনে নিতে পারে না। তারা শরিয়তি আইনের বাইরে একপাও ফেলতে প্রস্তুত নয়। সামাজিক নিয়ম, খাদ্যাভ্যাস সব পালটে দেয়। এমনকী নামও পালটে দেয়। ইচ্ছামতো বাবার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও বন্ধ করে দেয়। বহরমপুরের একটি সুন্দরী মেয়ে (বাবা-মা-এর একমাত্র কন্যা) এক মুসলমান যুবকের প্রেমে পড়ে সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে চলে গেছে। ৪-৫ বছর ধরে কোনো খোঁজ নাই। এ পর্যন্ত বাবা-মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বা করতে দেওয়া হয়নি। আর কোনো হিন্দু যুবতী এইভাবে অন্ধকারে তলিয়ে যাক তা কাম্য নয়। প্রতিটি হিন্দু পরিবারকে ভাবতে হবে তাদের মেয়েরা যেন হাসিখুসিতেই জীবন কাটাতে পারে। ওঁত পেতে থাকা বিধর্মীরা যেন আমাদের সমাজ থেকে আর চোরাশিকার করতে না পারে।

পরিবারের কল্যাণে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

সুতপা বসাক ভড়

প্রকৃতির কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী। একটু অনুভবী মন দিয়ে দেখলে আমরা দেখব যে, কীভাবে প্রকৃতিতেই আমাদের প্রায় সব সমস্যার সমাধান সাজানো আছে। পুজো-পার্বণ বা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অনেক সময় থালা-বাসনের অপ্রতুলতার জন্য আমরা ডিস্‌পোসেবেল থালা-বাটির ব্যবহার করে থাকি; যেমন প্লাস্টিক/ থার্মোকলের থালা-বাটি ইত্যাদি। অতীতের দিকে দৃক্‌পাত করলে দেখতে পাব যে, তখনও আমাদের পূর্বপুরুষরা একই সমস্যার সম্মুখীন হতেন। সেক্ষেত্রে, ওই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা প্রকৃতির ওপরই নির্ভরশীল থাকতেন। প্রকৃতিও দু'হাত উজাড়

করে তাঁদের প্রয়োজনটুকু মেটাত। এখন দৃশ্যটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। আমরা প্রাকৃতিক জিনিসকে অবহেলা করে কৃত্রিম জিনিস বেশি ব্যবহার করছি। তার ফলও পাচ্ছি। কৃত্রিম জিনিস ব্যবহারে প্রকৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে, পরিবেশ-দূষণ হয় এবং ওই দূষিত পরিবেশেই জীবনযাপন করতে আমরা বাধ্য হই। অথচ, আমরা যদি প্রাকৃতিক জিনিসের ব্যবহার বেশি করে করতে অভ্যস্ত হই, তাহলে ওই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ প্রকৃতির যে-কোনো জিনিস ব্যবহারের পরে প্রকৃতিতেই মিশে যায়, কোনো খারাপ প্রভাবও ফেলে না।

যেমন ধরুন, পুজোপার্বণ, উৎসবে পাতায় খাবার চল আমাদের একটি সুন্দর পরম্পরা। কলাপাতা, শালপাতায় খাবার খেলে একটা অন্যরকম স্বাদ পাওয়া যায়। কলাপাতা, শালপাতায় গরম ভাত দিলে সুন্দর একটা গন্ধ ওঠে। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত যখন প্লাস্টিক আমাদের জীবনে এতটা ছেয়ে যায়নি, তখন মিষ্টির দোকানে কচুরির তরকারি শালপাতা দিয়ে ঢেকে রাখত। এমনকী সিঙাড়া, কচুরি, জিলিপি ইত্যাদিও শালপাতার ঠোঙা বানিয়ে তার মধ্যে দিত, ওপর থেকেও শালপাতা দিয়ে ঢেকে দিত। শালপাতার কী অপূর্ব একটা সোঁদা গন্ধ থাকত সেই খাবারগুলিতে! অথচ এখন, পলিথিনের প্যাকেটে দেওয়ার ফলে ওই তরকারি থেকে শালপাতার ওই সোঁদা গন্ধটাই হারিয়ে গেছে। কিছু দোকান এখনও শালপাতার বাটিতে খাবার দেওয়ার প্রথাকে ধরে রেখেছে। মন্দিরে প্রসাদে এখনও পর্যন্ত শালপাতার ব্যাপক ব্যবহার চলছে, যা খুবই সন্তোষজনক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর এলাহাবাদে আয়োজিত মাঘমেলাতে শালপাতার বাটি এবং কাগজের প্লেটে প্রসাদবিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকী, কৃত্রিম ডিস্পোসেবেল থালা-বাটির ব্যবহার করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন নির্দেশও ছিল। সুতরাং, সুস্বাস্থ্য, ধর্মীয় প্রথা এবং পরিবেশ সবদিক বিচার করলে দেখব যে প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তৈরি থালা-বাটির কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত মহিলারাই বাড়িতে রান্না-খাওয়ার ব্যাপারটা দেখাশুনা করে থাকেন, সেজন্য তাঁরা যদি একটু সচেতনতার সঙ্গে ব্যবস্থাদি করেন, তবে পরিবার এবং পরিবেশ উভয়েরই মঙ্গল হবে।

কিছু বিশেষ গাছের পাতায় খাবার পরিবেশিত হলে, সেই খাদ্যের পুষ্টি অনেকটাই বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে। আমাদের দেশে যখন থেকে বুফে পার্টিতে খাওয়ার প্রচলন বেড়েছে, তখন থেকেই পাতায় খাবার খাওয়ার প্রথা প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। অথচ ডাক্তারের মতে ডিস্পোসেবেল থালা-বাটিতে খাবার খেলে ওইসব বাসনে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ খাবারের সঙ্গে মিশে পাচনক্রিয়াতে কুপ্রভাব ফেলে। ফলে নানারকম অসুখ হতে পারে, যেমন ত্বকের সমস্যা, এমনকী ক্যান্সার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। থার্মোকল বা স্টায়রোফোম দ্বারা তৈরি বাসনে বিস্ফিনোল নামক রাসায়নিক থাকে যা আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতিসাধন করে।

আমাদের দেশে গাছের পাতায় তৈরি বাসন শুদ্ধ মানা হয়, এগুলি খাবার পরে ধুতে হয় না। ব্যবহারের পরে মাটিতে পুঁতে দিলে জৈবিক সারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেসব গাছের পাতা থেকে বাসন তৈরি হয়, সেগুলিতে অনেক গুণ থাকে। বলা হয়, পলাশ পাতার তৈরি বাসনে খাবার খেলে সোনার বাসনে খাওয়ার মতো উপকার পাওয়া যায়, সেইরকম কলাপাতায় খাবার খেলে তা রুপোর বাসনে খাওয়ার ফল দেয়। আয়ুর্বেদে অনেক অসুখের চিকিৎসায় বিশেষ কোনো গাছের পাতার খাবার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতীতে ভারতে দু'হাজারের বেশি গাছের পাতার তৈরি বাসনে খাবার খাওয়ার প্রচলন ছিল, যার ফলে মানুষ সুস্থ জীবনযাপন করত। কিন্তু অতি আধুনিকতার দৌড়ে আমরা নিজেদের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি। প্লাস্টিক ও থার্মোকলের তৈরি থালা-বাটির পরিবর্তে কলাপাতা, শালপাতার বাসনে খাওয়ার প্রচলনকে আমরা এখনও ধরে রাখতে পারি। এই কাজে মহিলারাই সচেতনতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, কারণ প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা মহিলাদের অনেক বেশি। সেজন্য পরিবার এবং প্রকৃতির কল্যাণার্থে মহিলাদেরই এই ছোট্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। □

কানের সংক্রমণ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কানে পুঁজ একটি সাধারণ ঘটনা। প্রতি সাতটা পরিবারে অন্তত একজনের কানে পুঁজের ঘটনা থাকেই। কানে পুঁজ নিয়ে আলোচনা করার আগে কানের গঠন ও কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা উচিত।

কানের গঠন : কানের তিনটি অংশ, যথা— (ক) বহিঃকর্ণ, (খ) মধ্যকর্ণ (গ) অন্তঃকর্ণ।

বহিঃকর্ণ : বহিঃকর্ণের দুটি অংশ— (১) কানের পাতা (Pinna) একটি লুপ্ত প্রায় অঙ্গ। কিন্তু শব্দতরঙ্গ ধরতে সাহায্য করে। (২) কর্ণকুহর (External Auditory Cannel) শব্দ তরঙ্গকে কানের ভেতরের দিকে বয়ে নিয়ে যায়। কানের পর্দাকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। কানের খোল কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করে।

মধ্যকর্ণ : বহিঃকর্ণের থেকে কানের পর্দা (Tympnic Membrane) পর্যন্ত মর্ধ্যকর্ণে থাকে তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি— ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস এবং দুটি ছোটো মাংস পেশী। শব্দতরঙ্গ কানের পর্দাকে কম্পিত করলে ওই কম্পন এই তিনটি হাড়ের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে চলে যায়। মধ্যকর্ণ ইউস্টেশিয়ান নালী দিয়ে গলার ফাঁকে সঙ্গে যুক্ত আছে এই নালী দিয়ে মধ্যকর্ণে বায়ু চলাচল করে।

অন্তঃকর্ণ : অন্তঃকর্ণের গঠন অত্যন্ত জটিল, দেখতে শামুকের খোলার মতো। অন্তঃকর্ণের দুটি অংশ— (১) শ্রবণের জন্য ককলিয়া, (২) ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভেস্টিবুল। কানের পাশাপাশি যেসব অঙ্গ থাকে এবং যেগুলো কানের রোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেগুলো হলো— (১) ফেসিয়াল নার্ভ যা মুখমণ্ডলের অনেক মাংসপেশীর (চোখের পাতা-সহ) ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। জিভের স্বাদ, কিছু নালা গ্রন্থির ক্ষরণ, অশ্রুক্ষরণ ইত্যাদি ও নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) **সিগময়েড সাইনাস :** এটি একটি অত্যন্তস্ফীত শিরা। (৩) **ব্রেন :** ব্রেনের টেম্পোরাল লোব এবং সেরিবেলাম বেশি আক্রান্ত হয়।

কানে পুঁজ কেন হয়? (১) **কানে পুঁজ প্রধানত :** মধ্যকর্ণের প্রদাহের ফলে কানে পুঁজ হয় এবং তা পর্দাকে ফুটো করে যা আগে থেকেই থাকা ফুটো দিয়ে বাইরে আসে। মধ্যকর্ণের দুই ধরনের প্রদাহের ফলে পুঁজ পড়তে পারে।

(এ) অ্যাকিউট হঠাৎ প্রদাহ হওয়া Acute (Supurative Otitis Media Or A.S.O.M.)। (বি) ক্রনিক বা দীর্ঘদিন ধরে প্রদাহ হওয়া (Chronic Supperative Otitis Media বা C.S.O.M.)।

ক্রমিকপ্রদাহে (C.S.O.M) কান থেকে মাঝে মাঝে পুঁজ পড়তে থাকে, কখনও বেশি, কখনো বা কম, সাময়িকভাবে কিছুদিন বন্ধ থাকতেও পারে। ক্রমিক প্রদাহ দুই প্রকারের।

(a) Safe বা নিরাপদ : প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত তুলনামুলকভাবে নিরাপদ কারণ এটা মোটেই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। এক্ষেত্রে পুঁজের পরিমাণ বেশি হয়, পুঁজে কোনো দুর্গন্ধ থাকে না, পুঁজ আঠা আঠা হয়, ঠাণ্ডা লাগলে পুঁজ বাড়ে।

(b) Unsafe বা বিপজ্জনক : এক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি, পুঁজের পরিমাণ কম হয় কিন্তু পুঁজ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, চটচটে হয়। পুঁজের সঙ্গে যদি রক্ত আসে তবে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি এমনকী ক্যানসারও হতে পারে (বিশেষত বয়স্কদের ক্ষেত্রে যক্ষা বা টিবি রোগও কানে হতে পারে। এক্ষেত্রে পর্দাতে অনেকগুলো ফুটো হতে পারে এবং পুঁজ পাতলা হয়। বহিঃকর্ণের প্রদাহের ফলে কানে পুঁজ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অনেক বেশি ব্যথা হয় এবং কানে হাত দিলে ব্যথা উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভূত হয়।

কানের পুঁজের ফলাফল : পর্দার ফুটো থাকার ফলে শব্দতরঙ্গ পর্দার কম্পন ব্যবহার হয় ফলে শ্রবণ ব্যবহার হয়। এই ফুটোর মাপ অবস্থানের উপর নির্ভর করে দীর্ঘদিন পুঁজ থাকার ফলে নার্ভজনিত শ্রবণ দুর্বলতাও হতে পারে যা অপারেশনেও ঠিক করা যায় না।

সম্ভাব্য বিপদ : (১) ইনফেকশন মাসটয়েড হাড়ে (এই হাড়ের মধ্যে কান থাকে) ছড়িয়ে যেতে পারে একে বলে মাসটয়ডাইটিস। পরবর্তী পর্যায়ে কানের পিছনে সামনেও উপরে ফোঁড়া হতে পারে। (২) সেফিয়াল নার্ভ নষ্ট হলে— একদিকের মাংস পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে মুখ বেঁকে যাবে। চোখের পাতা পুরো বন্ধ হবে না। (৩) ভেস্টি নষ্ট হলে দেহের ভারসাম্য নষ্ট হবে। ফলে স্বাভাবিক হাঁটাচলা দুরূহ হয়ে যাবে। অন্ধকারে ভারসাম্য নষ্ট বেশি অনুভূত হয়। (৪) মাথার খুলির মধ্যে পুঁজ ঢুকে বিপত্তি ঘটাতে পারে মেনিনজাইটিস— রোগী মাথাব্যথা, অল্প অল্প জ্বর নিয়ে আসে। বমিও হতে পারে। ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। ব্রেনের ফোঁড়া কানের পুঁজ হাড়ের ক্ষয় করে বা শিরার মাধ্যমে ব্রেনে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ব্রেনের টেম্পোরাল লোব ও সেরিবেলাম (লঘুমস্তিষ্ক বেশি আক্রান্ত হয়। বেশি মাথা ব্যথা ও অল্প জ্বর নিয়ে আসে তবে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কমও হতে পারে। রোগী ক্রমশ অজ্ঞান হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সিগময়েড সাইনাসে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, কিছুক্ষণ বাদে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। মাথা ও ঘাড়ে বাথা হতে পারে।

কী করবেন : (১) পুঁজ বেশি হলে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত তুলো দিয়ে কান পরিষ্কার করতে হবে। (২) কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে কান সাকসান করে পরিষ্কার করাতে পারলে খুবই ভালো। (৩) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে ভালো ওষুধ আছে।

কী করবেন না : (১) নোংরা কাঠি, তুলো পালক ইত্যাদি কোনোকিছু কানে দেবেন না। (২) ডুবে স্নান করবেন না এবং স্নানের সময় যাতে কানে জল না ঢোকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

হোমিও চিকিৎসা : লক্ষণভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। যে সমস্ত ওষুধগুলি সচরাচর ব্যবহার করা হয় সেগুলি হলো মার্ক-সল, সাইলেসিয়া, মার্ক ডালসিস, হিপারসালফার, ব্যাসিলিনাম প্রভৃতি। তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। □

বঙ্গের কৃষি বাস্তুতন্ত্রে সর্প বৈচিত্র্য

বাণীব্রত রায় এবং কল্যাণ চক্রবর্তী

পৃথিবীতে বিষধর আর নির্বিষ সাপের অনুপাত প্রায় ১ : ৯। অর্থাৎ বিষধর সাপের সংখ্যাই কম। নির্বিষ সাপের সংখ্যা তার নয় গুণ। কিন্তু তবুও মানুষের মন মানে না। মেঠোচারী, বৃক্ষচারী, গর্তবাসী, সামুদ্রিক সাপ নির্বিষ হোক বা বিষধর— আমাদের আতঙ্কের আবহে ক্রমাগত নিধন হয়ে চলেছে। তবে আশার কথা, জনজাতি বহু সমাজের টোটেম ও ট্যাবু সাপের পক্ষে, তাই কিছুটা লোক সংস্কৃতিগতভাবে রক্ষাও পেয়েছে সাপ।

বঙ্গের লোকমানসে সর্পভীতি থেকেই মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি। চতুর্দশ শতাব্দীর কবি কানা হরিদত্ত রচিত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের কবি বিষ্ণুপালের 'অষ্টমঙ্গলা', ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণে তার প্রকাশ। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এও আমরা সর্প প্রজাতির নানান বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। এখানে দেবী মনসা নাগ-আভরণে সজ্জিত হয়ে ধর্মরাজ যমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন—

'সিন্দুরিয়া নাগে পরে শিরেতে সিন্দুর।
নাগরাজ দিয়া বান্ধে মাথার মঞ্জর।।
কাজলিয়া নাগে দেবী পরিল কাজল।
কর্ণফুল নাগে দেবী পরে কর্ণফুল।।
বরারিয়া নাগে পরে গলার পাটাগুলি।
পঙ্গরাজ নাগে পরে পায়েত পাশুলি।।
সঙ্খিনী নাগে দেবী হাতে পরে শাঁখা।
গাম্ভুর গম্ভীর নাগে ধ্বজের পতাকা।।
বড়ো বড়ো নাগ সব চারি পাশে বেরি।
উদয়কাল মহাকাল রথের চাকা বরি।।'

কাব্যের অন্যত্রও সর্পবৈচিত্র্যের কথা আছে, যে সমস্ত সাপের আগমনে দেবতারাও ভয় পেয়ে যান—

'আইরাজ নাগ/আইল নাগ মঞ্জরি।
সিংহমুখ নাগ/আইল বরহি প্রচরি।।
উরসা সাপিনী/আইল পদ্মার বোনঝি।
শত যোজন মুখখান/ষাইট যোজন জি।
কবি পর্বত হইতে/আইল মহাকালী।
শত শত হস্তী তার/ভোজন বিকালি।।
পদ্মার আদেশে নাগ/আসিল উর্ধ্বমুখে।
দেবগণ শুনিয়া/ভয় পায় বুকে।।'

কানা হরিদত্তের মনসামঙ্গল কাব্যের ভণিতায় 'সর্পসজ্জা' ছত্রে দেবী মনসার বিবরণ সর্পবৈচিত্র্যের পরিচয়বাহী—

'দুই হাতের সঙ্খ (শঙ্খ) হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী।।
সুতলিয়া নাগ কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি।।
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিতের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর।।'

সাপ এক ভয়ংকর-সুন্দর প্রাণী। লোককবি সাপের সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন বলেই মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় দেবী নানান সাপে সজ্জিতা— কোনো সাপ তার গলার হার, কোনো সাপ কাঁচুলি, কোনোটি হাতের বালা। এই নান্দনিকতা বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

অন্নদামঙ্গল কাব্যেও দেখা যায় কৃষিবাস্তুতন্ত্রে সর্পবৈচিত্র্যের কথা,

'কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সূঁচে ব্রহ্মজাল।।
শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।।
তক্ষক উদয়কাল ডারাশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া।।
ছাতাড়ে শীয়রচাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।।
বিছা বিছুপিঁপিড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর।।'

এখানে কোবরা গ্রুপের কেউটে (Indian Cobra), খরিশ/গোখরো (Common Cobra), শঙ্খচূড় (King Cobra) সাপের মতো বিষধর সাপের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া বিষধর শাঁখিনী (Banded Krait), শীয়রচাঁদা (কালো কালাচ Black Krait), বোড়া (চন্দ্র বোড়া Russell's Viper)-র মতো তীব্র বিষধর সাপের কথা আছে। এ সকলই বঙ্গের সর্প বৈচিত্র্য। এছাড়া নাম পাওয়া যাচ্ছে নির্বিষ এবং স্বল্প বিষধর কয়েকটি প্রজাতির সাপ, যেমন ময়াল (Rock Python), অজগর (Common Python), বোড়া চিতি (Wolf Snake), দাঁড়াশ (Rat Snake), কানাড়া বা কাঁড় (Common Cat Snake), লাউডগা (Whip/Vine Snake), বেতাছাড়া (Bronze Back Snake), মেটিলি, পুয়ে (Common Blind Snake), হেলে (Stipped Keelback), ঢোঁড়া (Checkered Keelback) ইত্যাদি।

সাপ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র লভ্য, লভ্য কৃষিবাস্তুতন্ত্রেও। বঙ্গের জমি-জিরেতে, জলে-জঙ্গলে সাপের অহরহ আনাগোনা ছিল; ছিল সর্পাঘাতে মৃত্যুর ঘটনাও। ভয়ে-ভক্তিতে মানুষ সাপকে পূজা করতে

শুরু করলো। তারই ধারবাহিকতায় শুরু হলো সর্প-চারণা বা স্নেক-লোর। দেবী মনসা হলেন বাঙ্গালি হিন্দুর সর্প-চারণার এক চরম আধ্যাত্মিকতা, নান্দনিক দার্শনিকতা।

ভারতীয় ডাকবিভাগ ২০০৩ সালে চারটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল সাপের ছবি দিয়ে। কৃষি-বাস্তুতন্ত্রে এই সাপগুলি ভারতের কোনো না কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই চারটি সাপ হলো বিষধর King Cobra বা শঙ্খচূড়, বিষধর Bamboo Pit Viper বা বাঁশ-বোড়া, ক্ষীণ-বিষ Gliding Sanke বা কালনাগিনী এবং নির্বিষ অথচ ভয়ঙ্কর Python বা অজগর।

জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে সর্প প্রজাতির সংখ্যা প্রায় শ' খানেক। আমাদের দেশে সর্প বৈচিত্র্য আনুমানিক পৌনে তিনশো। এই যে বৈচিত্র্য, তার মধ্যে বিষের পরিমাণ বা বিষহীনতার যেমন তফাৎ, তেমনই তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থেও ফারাক। আমাদের দেশে সবচেয়ে ছোটো সাপের নাম 'পুঁয়ে', আর সবচেয়ে বড়ো সাপটি হলো 'জালি অজগর' বা রেটিকুলেটেড পাইথন। পুঁয়ে সাপ ১০ সেন্টিমিটার, পাইথন সেখানে ১০ মিটার লম্বা। ভারতে বিষধর সাপের সংখ্যা পঞ্চাশের কিছু বেশি, এর অধিকাংশই সামুদ্রিক সাপ। ভারতের বিষধর সাপগুলি Elapidae (যেমন কেউটে, খরিশ, শঙ্খচূড়, শাঁখামুটি, কালাচ), Viperidae (চন্দ্রবোড়া, পাহাড়ি বোড়া, গেছো বোড়া, বুঁটি বোড়া, সবুজ বোড়া), Hydrophidae (সামুদ্রিক খড়গনাসা, কালশির, অঙ্গুরী ইত্যাদি) এবং Colubrodae পরিবারের অন্তর্গত। ভারতে যে সমস্ত সাপ থেকে মৃত্যু অধিক হয়, তা হচ্ছে কালাচ, চন্দ্রবোড়া, কেউটে এবং গোখরো। কেউটে এবং গোখরো ফণাধর সাপ; কালাচ এবং চন্দ্রবোড়া ফণাহীন; চন্দ্রবোড়া হিমাটোটক্সিক সাপ যার দংশনে রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং রক্ততঞ্চনে গণ্ডগোল হয়। খুবই বিষাক্ত সাপ কিং কোবরা বা শঙ্খচূড়, যা প্রবল বৃষ্টিপাতযুক্ত স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে থাকে এবং বাসা বানায়।

বাস্তুতন্ত্রে সাপ গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। খাদ্য-খাদক সম্পর্কে খাদ্যশৃঙ্খলে সাপের উল্লেখযোগ্য অবস্থান। খাদ্যশৃঙ্খলে সাপ শিকারির ভূমিকা পালন করে। ফসল যেমন রয়েছে, ফসলের শত্রুপোকা আছে, আছে ইঁদুর-বাদুড়, ফসলখেকো, মাছখেকো পাখি। আর রয়েছে তাদের সকলের চিরশত্রু সাপ। খাদ্য-খাদক সম্পর্কের জালে জড়িয়ে আছে এরা সকলে। কোনো সাপ থাকে ইঁদুরের গর্তে, কেউ উইয়ের ঢিপিতে। ইঁদুরের গর্ত সাপের প্রিয় শিকারের জায়গা। ইঁদুর যত না খায়, তার চেয়ে বেশি খাবার কেটে সংগ্রহ করে রাখে গর্তে। ইঁদুরের গর্তে থাকে অজস্র ছানাপোনা, তাই শিকারের পক্ষে ভালো জায়গা। গর্তে শিকার ধরতে আসে বালিবোড়া (Red Sand Boa), তুতুর (Common Boa), দাঁড়াশ (Indian Rat Snake), খেতমেটে, শাঁখামুটি (Banded Racer), কালাচ (Common Krait) প্রভৃতি।

উইয়ের ঢিপিতে সাপের বসবাস এবং উইপোকা খাওয়ার ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় দুধরাজ (Common Trinket Snake), দাঁড়াশ, উদয়কাল, শাঁখামুটি, কালাচের ক্ষেত্রে। বেত আছড়া, কঙ্করাজ, ঘরচিতি সাপ খড়ের গাদায় শিকারের সন্ধানে আসে। উত্তরবঙ্গের ঘাসজমি যেখানে মাঝারি, ঝোপঝাড় লুকোনোর সুবিধা আছে, সেখানে শিকারের সন্ধানে দেখা মেলে ময়াল (Indian Rock Python), অজগর (Python) সাপ। বালিয়াড়ির ঘাসজমিতে পাওয়া যায় বালিবোড়া। রাজ্যের নীচু ঝোপঝাড়ের ঘাসজমিতে পাওয়া যায় সবুজ ঢোড়া (Green Keelback), লাউডগা (Vine Snake), ভাড় (Mock Viper) সাপ। বৃক্ষবাসী সাপের মধ্যে কালনাগিনী (Ornate Flying Snake), বেত আছড়া (Common Bronzeback Tree Snake), সবুজ বেত আছড়া (Green Bronzeback Tree Snake), রংবাহার (Painted Brownback Tree Snake), বাদামি দাঁড়াশ (Indo-Chinese Rat Snake), বুঁটি বোড়া (Spot tailed Pit Viper), সবুজ বোড়া (White Lipped Pit Viper) প্রভৃতি সাপের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়।

সাপের ভূমিকা সত্ত্বেও, সাপের বিনাশ ঘটছে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষিবিষের অপব্যবহারের প্রাবল্যে। অনিচ্ছাকৃত বিষক্রিয়া বা নন-টার্গেট টক্সিসিটির কারণে সাপ মারা পড়ে কৃষি বাস্তুতন্ত্রের নানান স্থানে নিত্যদিন। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের এ একটি অনভিপ্রেত ঘটনা।

তথ্যসূত্র :

১. কৃষি বাস্তুতন্ত্রে সাপ, সর্পদংশন ও তার প্রতিকার— ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং ডাঃ অমিত ভট্টাচার্য, ২০১৬ পঞ্চায়েতিরাজ, ৯ (১১) নভেম্বর, পৃষ্ঠা : ২০-৩০।

২. বাংলার জৈববৈচিত্র্য ও লোকসংস্কৃতি— ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২৪ (তৃতীয় সংস্করণ) কবিতিকা, মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫৭।

৩. Snakes in Bengal : বাংলায় সর্পবৈচিত্র্য ও সর্পদেবী মনসা, কল্যাণ চক্রবর্তী, Kolkata News Today, July 16, 2023.

বঙ্গের বাস্তুতন্ত্রে সর্প বৈচিত্র্য

বাসস্থান, বহিরাকৃতি ও বিষাধার

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

পর্বত, অরণ্য, নদী, জলাভূমি, মালভূমি, তৃণভূমি, সমভূমি, মোহনা ও সমুদ্র-সৈকত সমন্বিত বঙ্গভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপের বাস। নানারকম ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পন্ন এই ভূখণ্ডে স্মরণাতীত কাল থেকে কচ্ছপ, কাছিম, কুমির, টিকটিকি, গিরগিটি, তক্ষক, গোসাপ, সাপ ইত্যাদি সরীসৃপের অবস্থান রয়েছে। প্রকৃতির কোলে গোপন বাসস্থানে ডেরা বাঁধা সর্প জাতীয় প্রাণীরা জীববিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা, সরু/মোটা, দীর্ঘ, নলাকার, বুকে হাঁটা, গুপ্ত স্বভাবের (cryptic) এই প্রাণীটিকে নিয়ে ছাত্র, গবেষক, প্রাণীবিদদের আগ্রহের শেষ নেই। বিবর্তনের প্রাচীন ধারা বেয়ে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় সর্পকুল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অসংখ্য নদী-নালা, ঘাসজমি, জলাভূমি, ধানজমি সংবলিত এই বঙ্গভূমি আদিকাল হতেই সর্পসংকুল। স্বাধীনতার সময়কালীন ভারত বিভাজনের কারণে বঙ্গভূমির পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান, পরবর্তীকালে বাংলাদেশে পরিণত হয়। বঙ্গভূমির যে অংশ ভারতে থেকে যায়, সেই পশ্চিমবঙ্গের সর্প বৈচিত্র্য বিষয়ে এই নিবন্ধের অবতারণা।

সাপের বিষের রাসায়নিক উপাদানের বিভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে বিষধর সাপের এই জৈববৈচিত্র্য— ভূ-প্রাকৃতিক বাসস্থানগত বৈচিত্র্য (জিওগ্রাফিক) এবং সংশ্লিষ্ট সর্পপ্রজাতিগুলির ডিমের নিষিক্ত হওয়ার সময় থেকে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সাপগুলির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (অন্টোজেনি) সম্ভূত। সাপেদের অনিশ্চয়তায় ভরা স্বভাব ও মেজাজ ছাড়াও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিষধর ও অবিষধর সাপেদের দ্বারা সর্প দংশনের ঘটনা ঘটে থাকে। মানব সভ্যতার বিকাশ লাভে সঙ্গে অরণ্যভূমি সমেত সাপেদের বাসস্থানও দ্রুত হারে ধ্বংস হয়ে চলেছে। বহু সর্প প্রজাতি এই কারণে বিরল থেকে অতি-বিরল হয়ে শেষে অবলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তাই ভুল ধারণা ত্যাগ করে সর্পকুলের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আজ বিশ্ব জুড়ে অনুভূত হচ্ছে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে যে অবিষধর ও বিষধর সাপগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, তার বিশদ বিবরণে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

ভারতীয় পাইথন: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Python molurus*। অতি পরিচিত এই সাপগুলি অজগর বা ময়াল নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ঘন বনে জঙ্গলে এই সাপের সন্ধান পাওয়া যায়। দীর্ঘতম সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯-২০ ফুট। ওজন হয় প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম। বিশালাকৃতির এই সাপটির গাত্রবর্ণ কালো, বাদামি, সাদাটে বা পীতাভ কালো। পাহাড়-পর্বতে, ঘন অরণ্যে, নদী ও ঝরনার ধারে এদের বাসস্থান দেখা যায়। বৃহদাকার হওয়ার কারণে সাপটি স্বভাবে অলস। সরলরেখায় চলতে অভ্যস্ত এই সাপটি শিকার ধরতে গাছে চড়তে বেশ দক্ষ। ছোটো ছোটো স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, ব্যাং, ছোটো গোসাপ, হাঁস-মুরগি, ময়ূর, ইদুর, খরগোশ, শজারু, ছোটো বাঁদর, হরিণ মূলত এদের খাদ্য। নদী, দীঘি, ঝিল বা ঝরনার ধারে লুকিয়ে থেকে জলচর পাখি ও অন্যান্য জলজ প্রাণীদের এরা শিকার করে থাকে। শরীরকে গোল করে শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে শিকারকে দমবন্ধ ও ঘায়েল করে তারপর ধীরে ধীরে এরা গিলে ফেলে।

কমন র‍্যাট স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Ptyas mucosus*। পাহাড়, মালভূমি, সমভূমি, শহর, গ্রামাঞ্চল--- সর্বত্র বিদ্যমান

এই সাপটি সাধারণত দাঁড়াশ সাপ বলে পরিচিত। দৈর্ঘ্য— ১.৬৫-২ মিটার। গাত্রবর্ণ অলিভ বাদামি বা ঈষৎ পীতাভ। দিনের বেলা সক্রিয় থাকা এই সাপটি জনবহুল অঞ্চলগুলিতে দিনের বেলা বিশেষ দেখা যায় না। স্বভাবে ভীরু হলেও উত্যক্ত করলে ঘুরে তেড়ে আসার প্রবণতা এই অবিষধর সাপটির রয়েছে। জলে সাঁতার কাটতে বা গাছে চড়তে এই সাপটি পটু। ইদুর, ছোটো টিকটিকি, পাখি, ব্যাং, চামচিকে ও ছোটো সাপ হলো এদের খাদ্য।

গোল্ডেন ট্রি (গ্লাইডিং) স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Chrysopelea*

ornata। দৈর্ঘ্য— ৪ ফুট সাড়ে ৫ ইঞ্চি। সাপের বাচ্চাগুলির দেহের উপরিভাগের রং কালো, ফ্যাকাশে সবুজ ও পীতাভ ক্রসবার বা ডোরাযুক্ত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ রঙের প্রভাবটিও সারা দেহ জুড়ে বাড়তে থাকে। এটি একটি অবিষধর সাপ। রঙিন চেহারাযুক্ত এই সাপটি মূলত বৃক্ষচারী। এছাড়াও ঝোপেঝাড়ে, ঘাসজমিতে এই সাপটির অবাধ বিচরণ। বঙ্গভূমিতে 'কালনাগিনী' নামেও এই সাপটি পরিচিত। দিনে বিচরণকারী এই সাপটি চামচিকে, ছোটো ছোটো গিরগিটি ও টিকটিকি জাতীয় প্রাণীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। যে কোনো গাছে উঠতে, গাছের প্রতিটি ডালে বিচরণে এই সাপটি খুবই পটু।

কমন উলফ্ স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Lycodon aulicus*। দৈর্ঘ্য— দুই থেকে আড়াই ফুট। হালকা বা গাঢ় বাদামি বর্ণের এই সাপটির গোটা দেহে ১২ থেকে ১৯টি হলুদ ছোপ/ডোরা (ক্রসবার) দেখা যায়। অবিষধর এই সাপটিকে জনবসতির কাছে পিঠে বা জনবসতির মধ্যেই দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই সাপটি 'ঘরচিতি' বা 'নেকড়ে সাপ' বলেও পরিচিত। ঘরবাড়ির ফাটলে, বিভিন্ন খাঁজে, পুরনো ভাঙা বাড়িতে এই সাপের আস্তানা। বহু ক্ষেত্রে সাপটি বাস্তু সাপ হিসেবে পরিচিত। দিনের বেলা সাপটি বাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে। অবিষধর হলেও উত্যক্ত করলে দংশনের প্রবণতা সাপটির রয়েছে। আক্রমণের সম্মুখীন হলে সাপটি দৃঢ়ভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটিকে দেহকুণ্ডলীর মধ্যে গুঁজে রাখে। সাপটি ধরা পড়লে পোষ মানে। যে কোনো গাছে বা বাড়ির ছাদে সাপটি খুব দ্রুত চড়তে পারে। টিকটিকি, ইদুর ইত্যাদি খেয়ে এরা বেঁচে থাকে।

ইয়েলোব্যান্ডেড উলফ্ স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Lycodon fasciatus*। দৈর্ঘ্য— ৯৫০ মিলিমিটার। পূর্ব হিমালয়ে এই সাপটির বাসস্থান। দার্জিলিঙের কার্শিয়াং থেকে শুরু করে মায়ানমার পর্যন্ত এই সাপটির হদিশ মেলে। সরু চেহারার এই সাপটির গোটা দেহে হলুদ ও কালো ব্যান্ড দেখা যায়। নিশাচর এই সাপটি পাহাড়-পর্বত, ঘন অরণ্যে ও ঝোপে বিচরণ করে। অবিষধর এই সাপটির বহিরাকৃতির সঙ্গে পূর্ব ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ব্যান্ডেড ক্রেট সাপটির অনেকটাই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। নানারকম ছোটো সাপ, টিকটিকি ইত্যাদি খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। অন্য অনেক সাপও আবার এই উলফ্ স্নেকগুলিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। উঁচু গাছে চড়তে এই সাপটি বেশ দক্ষ।

চেকার্ড কীলব্যাক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Xenochrophis piscator*। দৈর্ঘ্য— ১.৪৮ মিটার। পশ্চিমবঙ্গে এই সাপটি জলঢোঁড়া বা আটঘরিয়া নামে পরিচিত। জলজ এই সাপটির গাত্রবর্ণ পীতাভ, অলিভ-বাদামী বা অলিভ সবুজ। তার ওপরে পাঁচটি সারি দিয়ে কালো দাগ বা স্পট দেখা যায়। কালো দাগগুলি ছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে লাল বা গোলাপি রঙের দাগও দেখা যায়। উদরের অংশটি সাদাটে বা পীতাভ। উত্তেজিত অবস্থায় সাপটির গাত্রবর্ণ পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠে। পুকুর, দীঘি, নদী, নালা, জলাভূমি, ধানজমিতে এই সাপটিকে দেখা যায়। অবিষধর হলেও উত্তেজিত হলে গোটা দেহ টান করে ছোবল মারার প্রবণতা সাপটির রয়েছে। যে কোনো স্থানে ঝাঁপ দিতে বা জলে সাঁতার দিতে এই সাপটি বেশ পটু। ছোটো মাছ, ব্যাং, ব্যাঙাচি ইত্যাদি খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। বেজি বা নেউলের মুখোমুখি হলে এই সাপটি লড়াই থেকে পিছিয়ে আসে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই সাপটি আধা-বিষাক্ত (সেমি-ভেনোমাস্) হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই সাপের প্যারোটিড গ্রন্থি বা লালাগ্রন্থির নির্যাস কিছু ছোটো স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, টিকটিকি, তক্ষক ও ব্যাঙের ক্ষেত্রে বিষাক্ত ও প্রাণঘাতী হলেও বড়ো আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী বা মানুষের ক্ষেত্রে বিষ হিসেবে তা কার্যকরী নয়।

বাফস্ট্রাইপড্ কীলব্যাক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Amphiesma stolata*। দৈর্ঘ্য— ৬২০-৯০০ মিলিমিটার। গায়ের রং অলিভ বাদামি, মাথার দিকটা বাদামি, সাদা, হলদেটে বা ঈষৎ কমলা। একজোড়া করে সুস্পষ্ট কালো স্ট্রাইপে সাপটির ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত আবৃত। উদরের অংশটি সাদাটে, সেখানে কিছু কালো দাগও দেখা যায়। সমভূমি অঞ্চলে নদীর ধারগুলিতে, জলাভূমিতে, মাঠে ময়দানে, ক্ষেতে খামারে, ঘাসজমিতে, পতিত জমিতে এদের দেখা পাওয়া গেলেও পার্বত্য অঞ্চলে বেশ বিরল। বর্ষাকালে শান্ত স্বভাবের এই সাপটির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। শহরাঞ্চলের কালভার্টের নীচে, ড্রেনে, মাটির নীচে গর্তে,পাকা ও পোড়ো বাড়িতে এদের আস্তানা থাকে। সাপটিকে দিনের বেলাতেই সক্রিয় দেখা যায়। খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে এদের বাসস্থান। কুনো ব্যাং, সোনা ব্যাং ইত্যাদি নানারকমের ব্যাং মূলত এদের খাদ্য। দীর্ঘ একটি শ্বাস নিয়ে দেহকে টান করে ঘাড় ফুলিয়ে চললে এদের গায়ের এপিডারমাল স্কেলের নীলচে সিঁদুর রঙের বিচ্ছুরণ চোখে পড়ে।

কোন্ডানারাস্ স্যান্ডস্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Psammophis condanarus*। দৈর্ঘ্য— ১০৭৫ মিলিমিটার। দেহের পৃষ্ঠভাগ বাদামি বর্ণের, তার ওপর অলিভ সবুজ বা বাদামি হলুদ বর্ণের স্ট্রাইপযুক্ত। উদরের অংশটি হলুদ বর্ণের। পশ্চিম হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ও ঊষর অঞ্চলগুলিতে এই সাপের বাসস্থান। জঙ্গল ও তৃণভূমিতে বিচরণকারী এই সাপটি মূলত দিনে সক্রিয় এবং টিকটিকি, ব্যাং ও অন্যান্য সাপকে খেয়ে বেঁচে থাকে।

ইন্ডিয়ান গামা বা ক্যাট স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Boiga trigonata*। দৈর্ঘ্য— ১১৭০ মিলিমিটার। দেহের রং পীতাভ বাদামি, গোটা দেহ গাঢ় ছাপ যুক্ত। উদরের অংশটি সাদাটে, তার মাঝে আড়াআড়িভাবে লালচে বাদামি দাগযুক্ত। গাছপালায়, ঝোপেঝাড়ে মূলত অবিষধর এই সাপের বাস হলেও ঊষর অঞ্চলগুলিতেও এই সাপটিকে দেখা যায়। নিশাচর এই সাপটি গাছে চড়তে ও লাফ দিতে বেশ পটু। লেজের দিকটা টেনে ধরলে দংশনের প্রবৃত্তি চোখে পড়ে। ঘাড়ের দিকটা চেপে ধরলে এদের অ্যানাল গ্ল্যান্ড বা পায়ুগ্রন্থি হতে দুর্গন্ধযুক্ত একটি হলুদ-সাদা রস নির্গত হয়। ক্যালোটিস বা বাগানের টিকটিকি এদের প্রিয় খাদ্য।

কমন গ্রিন হুইপ স্নেক বা ভাইন স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Ahaetulla nasuta*। দৈর্ঘ্য— ১৩২৫-১৯৪৪ মিলিমিটার। পশ্চিমবঙ্গে এই সাপটি লাউডগা নামে পরিচিত। কলুব্রিডি পরিবারভুক্ত এই সাপটি মৃদু বিষযুক্ত। সাপটির গায়ের রং উজ্জ্বল সবুজ কখনও বা কলাপাতা সবুজ। উদরের অংশটি সাদা বা নীলচে ডোরা বা স্ট্রাইপযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল জুড়ে এই সাপটিকে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় সক্রিয় এই সাপের শরীর অনেকটা লতানে আকৃতির এবং লতাপাতার সঙ্গে সাযুজ্য থাকা তার গাত্রবর্ণ জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় cryptic colouration-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহিরাকৃতিগত এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো বিবর্তনের দান। ছোটো পাখি, টিকটিকি, ছোটো মাছ, ব্যাং ও ব্যাঙাচি খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। এই সাপের দংশনে মানব শরীরের বড়ো কোনো প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হলেও সাপের কামড়ানো জায়গাটি ফুলে থাকে এবং কিছুটা অসাড় হয়ে যায়।

ডগ ফেসড্ ওয়াটার স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Cerberus rhynchops*। দৈর্ঘ্য— ১২৭০ মিলিমিটার। ধূসর বর্ণের এই সাপটি দেহের নিম্নভাগ হালকা বাদামি হলুদ বর্ণের এবং উদরের অংশটি সবুজাভ কালো রঙের দাগযুক্ত। মোহনা অঞ্চলে ও সমুদ্র সৈকতে এই সাপটির অবস্থান। জোয়ারের জলে পুষ্ট নদীতে, নোনা জলযুক্ত খাঁড়িতে এবং সমুদ্রে এই সাপটি বিচরণ করলেও ম্যানগ্রোভ গাছগুলিতেও এই সাপটিকে দেখা যায়।

প্রচণ্ড উত্ত্যক্ত হলে এদের মধ্যে দংশনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

ইন্ডিয়ান এগ ইটিং স্নেক: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Elachistodon westermanni*। সাপটিকে মূলত উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। অলিভ সবুজ ও কালো রং মেশানো গায়ের রং এই সাপটির দেহের ধারগুলি সাদা। অন্য প্রাণীদের ডিম ভক্ষণ করা এই সাপটি ভারতে সম্ভবত বিরলতম সাপ।

কমন ইন্ডিয়ান ক্রেট: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Bungarus caeruleus*। দৈর্ঘ্য— ১.২-১.৭৩ মিটার। বঙ্গদেশে অত্যন্ত বিষধর এই সাপটি 'কালাচ' বা 'ঢোমনাচিতি' নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে এলাপিডি পরিবারভুক্ত এই সাপের উপদ্রব চোখে পড়ে। ঘন কৃষ্ণবর্ণের এই সাপটির গাত্রবর্ণ কখনও-বা নীলচে কালো। দেহ জুড়ে আড়াআড়িভাবে একাধিক দাগ বা ছোপ দেখা যায়। মাঠে-ময়দানে, ঝোপেঝাড়ে, জল-জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই সাপটির অবাধ বিচরণ। এই সাপটির দ্বারা দংশনের ঘটনা অসংখ্য। জনবসতি অঞ্চলে এই সাপটির দৌরাত্ম্য ছাড়াও অসংখ্য মানুষকে দংশনের ঘটনা জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের অত্যন্ত চিন্তার কারণ। এরা মূলত অন্যান্য সাপ খেয়েই বেঁচে থাকে। এই সাপের বিষের রং হলুদ ও কমলা মেশানো। মানুষের ক্ষেত্রে এই বিষ ভয়ংকর প্রাণঘাতী। সর্প দংশন হলেই মানব শরীরের লোহিত রক্তকণিকাগুলি ভেঙে যায়, স্নায়ুতন্ত্র অসাড় হয়ে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎপ্যারালিসিস বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। শরীরের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের দরুন প্রচণ্ড পেটব্যথা ও রক্তবমির ঘটনা ঘটে। শ্বসন তন্ত্রের বিপর্যয়ের ফলে অক্সিজেনের অভাবে বা অ্যাসফিক্সিয়ায় মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই সাপের বিষ হলো Bungarotoxin সংবলিত, যা এক প্রকারের নিউরোটক্সিন।

ব্যান্ডেড ক্রেট: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Bungarus fasciatus*। দৈর্ঘ্য— ১৮২৮-২১২৫ মিলিমিটার। ইয়েলো ব্যান্ডেড উলফ্ স্নেকের সঙ্গে এই সাপটির গাত্রবর্ণ ও বহিরাকৃতির সাদৃশ্য রয়েছে। বঙ্গভূমিতে এই সাপটি শাঁখামুটি বা ডোরা কালকেউটে নামে পরিচিত। সারা দেহে হলুদ-কালো ব্যান্ড বা ডোরাযুক্ত অত্যন্ত বিষধর এই সাপটির বিষও Bungarotoxin সংবলিত। বন, জঙ্গল ছাড়াও জনবসতি এলাকাতেও এই সাপটির দেখা মেলে। মূলত নিশাচর এই সাপটি নদ-নদীর ধারে আর্দ্র জায়গাগুলিতে থাকে। বিষধর এই সাপটি স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত ও অলস। বর্ষাকালে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষণীয়। র‍্যাট স্নেক (দাঁড়াশ সাপ), ক্যাট স্নেক-সহ অন্যান্য সাপ মূলত এদের খাদ্য। এছাড়াও টিকটিকি, অন্যান্য সাপের ডিম ও ছোটো মাছ এরা খেয়ে থাকে। এই সাপটি অত্যন্ত বিষধর হলেও দংশনের প্রবৃত্তি না থাকায় এই সাপের দংশনের ঘটনা খুব বেশি নথিবদ্ধ হয়নি। গোখরো সাপের বিষ হতে এই সাপের বিষ কমজোরি হলেও দংশনের ২০ মিনিটের মধ্যে একটি বলদের মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত রয়েছে।

ইন্ডিয়ান কোবরা: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Naja naja*। দৈর্ঘ্য— ১৬২৫-২২৫০ মিলিমিটার। বঙ্গে এই সাপটি গোখরো বা কেউটে নামে বহুল পরিচিত। ফণাযুক্ত এই সাপ মূলত তিনটি উপপ্রজাতিতে বিভক্ত— স্পেক্ট্যাকলড্ বা বাইনোসেলেট কোবরা, মনোসেলেট কোবরা ও ব্ল্যাক কোবরা। বাইনোসেলেট গোখরোর সাদা-কালো রঙের ফণার পিছনের দিকে শ্রীকৃষ্ণের খড়মের মতো চিহ্ন দেখা যায়। গাত্রবর্ণ বাদামিও কালো, কখনও ঈষৎ হলুদাভ। মনোসিলেট গোখরোর ফণার পিছনে হলুদ ও কমলা রঙের গোলাকৃতির চিহ্ন দেখা যায়। পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, মরুভূমি অঞ্চলে গোখরোদের বাস। এছাড়াও বনজঙ্গল, পুরনো বাড়ি, উইপোকার

ঢিবিতে, কৃষিজমিতে এদের আস্তানা দেখা যায়। কিছুটা শান্ত স্বভাবের হলেও অস্থির মেজাজের এই সাপটি খেপে গেলে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক ও ভয়াল রূপ ধারণ করে। দংশনের সময়ে শরীরের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ সোজা ও টানটান করার পর আচমকা ফণাকে পিছনে নিয়ে গিয়ে তারপরেই ছোবল দিয়ে বিষ ঢেলে থাকে এই সাপ। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় অনবরত জিভ বের করতে থাকে এই সাপ। ইদুর, ব্যাং, টিকটিকি, ছোটো পাখি ও অন্যান্য সাপকে খেয়ে গোখরো সাপ বেঁচে থাকে। এদের বিষদাঁতের মাপ হলো ৭ মিলিমিটার। গোখরোর বিষ Cobratoxin সংবলিত। ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের মানুষের ক্ষেত্রে বিষের প্রাণঘাতী ডোজ হলো— ১৫-১৭.৫ মিলিগ্রাম। প্রতি বার দংশনে গোখরো ২১১ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ ঢেলে থাকে। গোখরোর বিষে রেসপিরেটরি প্যারালিসিস (শ্বসনতন্ত্রের পক্ষাঘাত) ঘটে থাকে। এছাড়াও স্নায়ুতন্ত্রও প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দংশনের অব্যবহিত পরেই প্রতিষেধক অ্যান্টি ভেনম হিসেবে পলিভ্যালেন্ট সেরাম প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এছাড়াও স্নায়ুতন্ত্র রক্ষায় নিওস্টিগমিন বা অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ জাতীয় ওষুধ বেশ কার্যকরী। জিনগত মিউটেশনের কারণে অতিবিরল অ্যালবিনো কোবরার সন্ধানও পাওয়া যায়।

কিং কোবরা বা হ্যামড্রিয়াড : বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Ophiophagus hannah*। দৈর্ঘ্য— ৫.৫ মিটার। গাত্রবর্ণ হালকা বাদামি থেকে বাদামি কালো। বাচ্চা অবস্থায় দেহ জুড়ে অনেক ব্যান্ড বা ডোরা দাগ থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে ডোরাগুলি কিছুটা মিলিয়ে যায়। বঙ্গভূমিতে এই সাপটি রাজগোখরো বা শঙ্খচূড় নামে পরিচিত। মূলত পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এদের বাস হলেও বঙ্গের পাহাড়, পর্বত, তৃণভূমি ও সমতলে সংখ্যায় খুব কম হলেও এদের দেখা মেলে। এই প্রজাতির সাপ বেশ বিরল। দিনের বেলায় সক্রিয় এই সাপটি খুব দ্রুত বেগে তার শিকারকে ধাওয়া করতে পারে। অত্যন্ত রাগী মেজাজের এই সাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হলো দংশন। কোনো প্ররোচনা ছাড়াও এই সাপ সর্বত্র ছোবল দিয়ে থাকে। বিষধর প্রজাতির সর্পকুলে এই সাপ দীর্ঘতম। দংশনের জায়গাটিকে রীতিমতো চিবিয়ে দিয়ে এরা বিষ ঢেলে থাকে। সব রকম সাপ খেয়ে মূলত এরা বাঁচলেও কখনও এরা বড়ো গিরগিটি বা গোসাপকেও খেয়ে থাকে। এদের বিষের রং হলো সাদা ও স্বচ্ছ, রাসায়নিক প্রকৃতি ঈষৎ আম্লিক। মানুষের জন্য দশটি লেথাল (প্রাণঘাতী) ডোজ একবারের দংশনে নির্গত করে রাজগোখরো। বিষ প্রযোগের ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে দংশিত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত।

রাসেলস্ ভাইপার : বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Daboia russelli*। দৈর্ঘ্য— ১২০০-১৬৭৫ মিলিমিটার। বিভিন্ন শেডের বাদামি রঙের গাত্রবর্ণযুক্ত এই সাপ ভাইপেরিডি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও গোটা দেহে সাদা, কালো, বাদামি রঙের অসংখ্য ছোপ দেখা যায়। বঙ্গভূমিতে এই সাপটি 'চন্দ্রবোড়া' বা 'উলুবোড়া' নামে পরিচিত। হিমালয় পর্বত, হিমালয়ের পাদদেশ ও গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল জুড়ে এই সাপটির অবস্থান। সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে এই সাপের উপদ্রব খুব বেশি। জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ইদুরদের সন্ধানে এরা হানা দিয়ে থাকে। স্বভাবে অলস হলেও এই সাপটি তিরিক্ষি মেজাজ সম্পন্ন এবং সর্বক্ষণ দংশনের প্রবৃত্তি বিশিষ্ট। এই সাপটি তার প্রতিনিয়ত ফোঁসফোঁসানির জন্য বিখ্যাত। ছোটো পাখি, ইদুর, ছুঁচো, ক্যালোটিস, টিকটিকি ও ব্যাং খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। বিষদাঁতের মাপ ১৬ মিলিমিটার। বিষের রং সাদা ও স্বচ্ছ, রাসায়নিক প্রকৃতি আম্লিক। একবারের দংশনে ৭২-১৪৫ গ্রাম বিষ এরা ঢেলে থাকে। দংশিত ব্যক্তির রক্তচাপ দ্রুত নামতে থাকে, হৃৎপিণ্ডের শক্তি কমতে থাকে। লোহিত রক্তকণিকাগুলি ধ্বংস হতে থাকে। আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলে রক্তবমি হতে থাকে। দংশনের স্থানটির কোষ ও কলাগুলি নষ্ট হয়ে দগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো চিহ্ন তৈরি হয়। সর্প দংশনের পরেই অবিলম্বে অ্যান্টিভেনম সেরাম (এভিএস) হিসেবে পলিভ্যালেন্ট সেরাম প্রয়োগ অতি প্রয়োজনীয়।

স'-স্কেলড্ ভাইপার: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Echis carinata*। দৈর্ঘ্য— ৬১০-৭৮৮ মিলিমিটার। গাত্রবর্ণ ফ্যাকাশে বাদামি, হালকা বাদামি হলুদ। তার মাঝে গাঢ় বাদামি বা কালো ছোপযুক্ত দাগ দেখা যায়। মাথার দিকে ত্রিশূলের মতো একটি চিহ্ন দেখা যায়। এই ভাইপারগুলির হিস হিস শব্দও রাত্রিতে বেশ ভয়াল ও গা-ছমছমে বলেই মনে হয়। সেন্টিপিড জাতীয় বিছে, কাঁকড়াবিছে, বড়ো পোকামাকড়, ইদুর, টিকটিকি ও ব্যাং খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। বিষদাঁতের মাপ প্রায় ৫ মিলিমিটার। প্রতি বারের দংশনে এরা প্রায় ১২ মিলিগ্রাম বিষ ঢেলে থাকে। গোখরোর বিষের থেকেও পাঁচগুণ বিষাক্ত হলো স'স্কেলড্ ভাইপারের বিষ। মানুষের জন্য এই বিষের মারণ (লেথাল) ডোজ হলো— ৫ মিলিগ্রাম। লোহিত রক্তকণিকাগুলিকে ধ্বংস করে এই বিষ নিমেষে হৃদরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও কিডনি ও স্নায়ুতন্ত্রকে শেষ করে দেয় এই বিষ। বিষ দংশিত হলে অনতিবিলম্বে পলিভ্যালেন্ট সেরাম প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। সময়ে চিকিৎসা না হলে ২৪ ঘণ্টা বা তার কম সময়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

গ্রিন বা বাম্বু পিট ভাইপার: বিজ্ঞানসম্মত নাম: *Trimeresurus gramineus*। দৈর্ঘ্য— ৭৬০-১১১৭ মিলিমিটার। সাধারণত বাঁশঝাড়ে ভাইপেরিডি গোত্রের এই সাপের বাস। গাত্রবর্ণ ঘাসের মতো সবুজ। পেটের অংশটি উজ্জ্বল সাদা, হলুদ বা সবুজ বর্ণযুক্ত। লেজের দিকটি হলুদ বর্ণের। পৃষ্ঠভাগে অলিভ সবুজ রঙের ক্রসবারের দাগ দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলের বনজঙ্গল থেকে শুরু করে সমভূমি অঞ্চলের বাঁশঝাড়ে ও হালকা ঝোপঝাড়ে গর্ত করে হয় এই সাপের বাস। উত্তেজিত ও প্ররোচিত হলে গাছ বা বাঁশের একটি শাখার সঙ্গে দেহের পশ্চাদ্‌ভাগকে ইংরাজি এসের মতো দৃঢ়ভাবে পেঁচিয়ে নিয়ে দেহের অগ্রভাগকে সোজা করে সম্পূর্ণ হাঁ করে বা মুখ খুলে দংশনের প্রবণতা এই সাপেদের মধ্যে দেখা যায়। বিষ প্রয়োগের স্থানটি প্রচণ্ড ফুলে যায়। এই বিষের কাজ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। মানব শরীরে প্রবল ব্যথা, বমি ও জ্বরের কারণ হলো এই বিষ। পুরোপুরি প্রাণঘাতী না হলেও ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী হয় এই সব উপসর্গ। ছোটো পাখি, ইদুর, ছুঁচো, টিকটিকিকে খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। শিকারের ওপর আঘাত হানার সময় এদের লেজের ডগা বা শেষ প্রান্ত কম্পিত ও আন্দোলিত হতে থাকে। নেপাল লাগোয়া দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে **হিমালয়ান পিট ভাইপারের** সন্ধান পাওয়া যায়, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম— *Gloydius himalayanus*।

উপরোক্ত সাপগুলি ছাড়াও সমুদ্রে হাইড্রোফিডি গোত্রভুক্ত তিনটি সাপের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের নামগুলি যথাক্রমে— **হুক নোসড্ সি স্নেক** (বিজ্ঞানসম্মত নাম— *Enhydrina schistosus*), **অ্যানিউলেটেড সি স্নেক** (বিজ্ঞানসম্মত নাম— *Hydrophis cyanocinctus*) ও **ব্যান্ডেড সি স্নেক** (বিজ্ঞানসম্মত নাম— *Laticauda colubrina*)। সমুদ্রে বিচরণকারী এই সাপগুলি সমুদ্র সৈকত বরাবর দীঘা, শঙ্করপুর ইত্যাদি স্থানে মাছ ধরার সময়ে মৎস্যজীবীদের জালে উঠে আসে। অনেক সময় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারেও প্রায় ২ মিটার দৈর্ঘ্য সম্পন্ন এই সাপ ধরা পড়ে। প্রবালপ্রাচীর ও অন্যান্য সামুদ্রিক স্তরে বিচরণরত এই সাপগুলি খুবই বিষধর। জালে মাছের ঝাঁক আটকা পড়লে ট্রলারে মাছ ভর্তি সেই জাল তুলে তা খোলার সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন তাই জরুরি। কারণ জালের মধ্যে মাছের ঝাঁকের মধ্যেই ঢুকে থাকে এই সাপ। মুহূর্তের অসতর্কতায় এই সাপের দংশনে মৎস্যজীবীদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ■

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রাজ্য কার্যকারিণীর বৈঠক

গত ৫ ও ৬ জুলাই অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (উচ্চশিক্ষা)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রাজ্য কার্যকারিণীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সল্টলেকস্থিত ঐকতান সভাকক্ষে। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং সরস্বতী বন্দনার মধ্যে দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্ববর্তী সভাপতি অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন NITTTR-এর ডিরেক্টর প্রফেসর দেবীপ্রসাদ মিশ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন MAKAIAS-এর প্রফেসর রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, সংগঠনের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর, অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক ভি লক্ষ্মণ। দুদিনে সভায় সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতির বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন ভি লক্ষ্মণজী। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের ওপর আলোকপাত করেন প্রফেসর দেবীপ্রসাদ মিশ্র। সভায় ১১৮ সদস্য-সহ মোট ১২৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকে নতুন রাজ্য সমিতি গঠিত হয়। অধ্যক্ষ— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঞ্জীব নাগ। সহ অধ্যক্ষ — ড. পাপিয়া মিত্র। সাধারণ সম্পাদক--- অধ্যাপক অনুপম বেরা। অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক — ড. বিপুল সরকার এবং ড. প্রশান্ত সরকার। রাষ্ট্রগীতের পর সভার সমাপ্তি হয়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

হাওড়া জেলার জয়পুর খণ্ডের (আমতা-২) নওপাড়া মণ্ডলের নওপাড়া শমী চণ্ডীমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে গত ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার ৫২ জন রক্ত দান করেন। রক্ত সংগ্রহ করে আমতা সদর হাসপাতাল।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট এবং আমতা-২ ব্লকের B.M.O.H.। রক্তদান শিবিরকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্রিয় সহযোগিতা করে নওপাড়া শিবাজী শাখার স্বয়ংসেবক এবং বিবিধ ক্ষেত্রের কার্যকর্তারা।

ভারত বিকাশ পরিষদ এবং সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজের উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশ

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৬ জুলাই ভারত বিকাশ পরিষদ এবং সেন্টার ফর ভারত স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় ভাষা পরিষদের সভাগৃহে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও রচনার এক অভিনব সংকলন প্রকাশ করেন ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকের নাম **বক্তৃতা ও রচনা— ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**। পুস্তকটির ভূমিকা লিখেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ জীবনীকার অধ্যাপক তথাগত রায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে শ্রোতাদের সমৃদ্ধ করেন অধ্যাপক তথাগত রায়, ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ, রাজর্ষি লাহিড়ী, গ্রন্থ সংকলক ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট আইনজীবী নন্দলাল সিংহানিয়া প্রমুখ।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে রথযাত্রার আয়োজন করা হয় নদীয়া জেলার বীরনগরের জয়পুর গ্রামে। পাশাপাশি এই উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ৩৩০টি পরিবারের হাতে হিমসাগর, আম্রপালি আমচারা এবং সবেদা চারা তুলে দেওয়া হয়। এদিন সকাল থেকেই রথযাত্রা নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল। অঞ্জলি মোদকের পৌরোহিত্যে জগন্নাথদেবের পূজার্চনা হয়। পূজার্চনার পর দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিলন খামারিয়া রথযাত্রা ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এরপর সবাই রথযাত্রায় শামিল হন। শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন ডাঃ রমেন বিশ্বাস, ঊর্মিলা খামারিয়া, পারুল খামারিয়া, রাজেশ মোদক, অনীক মোদক প্রমুখ।

আরোগ্য ভারতীর পরিচালনায় আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ শিবির

গত ৬ জুলাই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর একল ভবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আরোগ্য ভারতীর পরিচালনায় আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৪৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ প্রমুখ মুরলী কৃষ্ণ, অখিল ভারতীয় মধুমেহ যোগ প্রবন্ধক ড. অভিজিৎ ঘোষ, পূর্ব ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল, সহ সচিব রাজেশ কর্মকার, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ সভাপতি জয়ন্ত সেন, সচিব দিলীপ সরকার, কলকাতা মহানগর অধ্যক্ষা শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, সচিব গোপাল হালদার, শিবিরের কোষাধ্যক্ষা অমলা বসাক, যোগ প্রশিক্ষক রণদীপ বোস ও শঙ্কর গুপ্ত, ডাঃ সুনন্দ দে (সার্জেন), ডাঃ কল্লোল দাঁ (শিশুবিশেষজ্ঞ), ডাঃ নীলমাধব ব্যানার্জি, ডাঃ শৈলেন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

মোটেই ভয়ংকরী নন দেবী মনসা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কাছের ও দূরের দেবী : চড়াই-উতরাই বেয়ে এগিয়ে যায় মানুষের জীবন। এটাই নিয়ম। কিন্তু দেবদেবীর ক্ষেত্রেও এই উত্তরণ-অবতরণের বিবর্তন লীলা প্রকট হয়ে উঠলে, তা অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। দেবী মনসার ক্ষেত্রে এই লীলাতরঙ্গের ঝড় উঠেছিল বলেই এই দেবী একই সঙ্গে ঘরের কাছের আপনজন এবং ভয়-সমীহের কারণেই আবার দূরের, অথচ নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। সমগ্র বঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম ইত্যাদি পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মতোই উত্তর ভারতে হরিদ্বারের মনসাপীঠে, দক্ষিণের অন্ধ্র, কর্ণাটক ইত্যাদি রাজ্যেও সমান ভক্তি ও আন্তরিকতায় পূজিতা হন দেবী মনসা।

অজস্র নাম দেবী মনসার। তারই মধ্যে বারোটি নাম একই সঙ্গে বিশেষ অর্থবহ। ওই নামের মধ্য দিয়েই বিকশিত দেবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি। পুরাণমতে দেবী মনসার ওই বারোটি নাম হলো— জরৎকারী, জগদ্‌গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিকমাতা, বিষহরী ও মহাজ্ঞানযুক্তা।

মনসা দেবীর এই দ্বাদশ নামের অর্থ এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেবী ভাগবত (৯।৪৮) ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (২।৪৫) যা বলা হয়েছে তার সারকথা— ঋষি কশ্যপের মানসলোক থেকে উদ্ভূতা বলে দেবীর নাম মনসা। অন্য ব্যাখ্যায়, যোগবলে তিনি নিয়ত হরিধ্যান করার কারণেই মনসা নামে খ্যাতা হন।

জরৎকারুর মতো দেবীর ক্ষীণদেহ দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নাম রাখেন জরৎকারী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ও ব্রহ্মলোক ইত্যাদির সমস্ত লোকের মনোহারিণী, সুন্দরী ও গৌরবর্ণা বলে নাম হয় তাঁর জগদ্‌গৌরী। শিবের শিষ্যা— তাই তিনি শৈবী। বিষ্ণু ভক্তির কারণে তিনি বৈষ্ণবী। বাসুকী নাগের ভগিনী বলে তাঁর নাম হয় নাগভগিনী। আবার জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে নাগদের রক্ষা করার কারণেই তিনি নাগেশ্বরী। বিষ হরণ করতে পারেন বলে তিনি বিষহরী। মহাদেবের কাছ থেকে সিদ্ধিযোগ লাভ করে তিনি হন সিদ্ধযোগিনী। উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করে মৃত মানুষকে সঞ্জীবিত করতে পারেন বলেই তিনি মহাজ্ঞানযুক্তা। আবার মুনিশ্রেষ্ঠ জগৎপূজ্য মহাত্মা যোগী জরৎকারুর পত্নী— তাই তিনি জরৎকারুপ্রিয়া। আস্তিক মুনির মাতা বলে তিনি আস্তিকমাতা।

মনসাপূজার সময় দেবীর এই দ্বাদশ নাম পাঠ করলে পাঠক এবং তাঁর বংশের আর সর্পদংশনের ভয় থাকে না। প্রতিদিন যিনি এই দ্বাদশনাম পাঠ করেন, তাঁকে দেখলেই সাপেরা দূরে পালিয়ে যায়। দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত— দুই পুরাণেরই আশ্বাস, দশ লক্ষবার স্তব পাঠ করলে পাঠক হবেন সিদ্ধ। তখন তিনি নিজে বিষ পর্যন্ত পান করতে পারবেন। কোনো ক্ষতিই হবে না তাঁর।

গৃহে অথবা বারোয়ারিতলায় : দেবী মনসার পূজা ও খ্যাতি— দুই-ই এখন সাপের দেবী হিসেবে। দেবী নিজে সাপ নন অথচ সকলে তাঁকে ডাকে সর্পমাতা বলে। সাপের মতো বিষধর প্রাণীর হাত থেকে বাঁচতে এবং সাপের বিষ থেকে মুক্তি পেতেই করা হয় এখন মনসার পূজা। প্রায় গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মনসার পূজা হয় সাপের

উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সারা বছর ধরে মনসার ঘট পেতে বহু জায়গায় নিত্য আরাধনা হলেও, মূলত বর্ষাকালে অর্থাৎ, আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের পঞ্চমীতিথি অথবা সংক্রান্তির দিন মনসার পূজা হয় অত্যন্ত ধুমধাম করে।

মনসার পূজা অথবা ব্রত পালন করা হয় ব্যক্তিগতস্তরে পারিবারিকভাবে। আবার বিভিন্ন গ্রামেই এইসময় মনসার পূজা হয় সমবেতভাবে— গ্রামের বারোয়ারিতলায় অথবা এই পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা, যাকে বলা হয় মনসার থান বা স্থান। এই পূজা উপলক্ষ্যে বহু গ্রামে বসে বিশেষ মেলা। কোথাও কোথাও হয় সাপের ঝাঁপান। যেখানে নানা জায়গা থেকে এসে জড়ো হন সাপুড়েরা। দেখান সাপের নানা খেলা। এখন অবশ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের কারণে সাপের এই ঝাঁপান বা খেলা দেখানো বস্তুত বন্ধই আছে। তবে কোথাও কোথাও লুকিয়ে চুরিয়ে প্রতীকী খেলা এখনও দেখানো হয়। তবে আগের সেই রমরমা আর নেই।

বিবাহ, প্রজনন ও সুফসলের দেবী : আদিতে মনসা কিন্তু কেবলই সাপের দেবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রজনন এবং বিবাহের দেবতা। কৃষির দেবতা হিসেবেও পূজিতা হতেন তিনি। তিনি ছিলেন লক্ষ্মীর একটি রূপ— ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির দেবী। মানুষ তাঁর পূজা করত ঐশ্বর্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে শুভ ও মঙ্গলকর, সার্থক বিবাহ, সুপ্রজননের জন্য। কৃষিপ্রধান দেশে সুফলনের প্রত্যাশাতেও পূজা করা হয় তাঁর।

ইতিহাসকার ও সমাজবিদরা দেবী মনসার উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন— ইনি হলেন লৌকিক দেবী। লোকায়ত সমাজের নিম্নবর্গীয়রা যে দেবীর পূজা করতেন, কালে তাঁকেই দেওয়া হয় একটি পৌরাণিক রূপ। নির্দিষ্ট হয় পৌরাণিক পূজাবিধিও। অনেকে দেবী মনসার সঙ্গে মিশরীয় দেবী আইসিসের একটা মিল খুঁজে পান।

আনন্দ কুমারস্বামী ও ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের মিথস্ অফ দ্য হিন্দুস অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস্ (কিসিংজার পাবলিশিং) গ্রন্থে (৩৩০ পৃষ্ঠায়) বলেছেন— মনসা পূজা প্রসঙ্গে যে চাঁদ সওদাগরের কাহিনি তা প্রাচীন গ্রিক সমাজের মাইসেনিয়ান সভ্যতার মতোই প্রাচীন। এর মধ্য দিয়ে শৈব পরম্পরা ও বঙ্গের লৌকিক ধর্মবিশ্বাস দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের শেষে মনসা স্বীকৃতি পেয়েছেন শাক্ত দেবী হিসেবে।

প্রসঙ্গত, গ্রিসে মাইসেনিয়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ব্রোঞ্জযুগের শেষ পর্যায়ে। এই সভ্যতার ব্যাপ্তির কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ থেকে ১০৫০ অব্দ অর্থাৎ প্রায় সাতশো বছর। এই সভ্যতার উৎসস্থল ছিল মাইসেনি (Mycenae)।

উৎস বেদে : বহু ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত, মনসা আদিতে লৌকিক দেবী। জনজাতিরা ছিলেন তাঁর পূজক, উপাসক। পরবর্তীকালে লৌকিক দেবী জায়গা করে নেন মূলধারার নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে। সেখান থেকেই শুরু হয় মনসার পৌরাণিকীকরণ। কালে তিনি হয়ে ওঠেন উচ্চবর্গীয়, বিশেষ করে বণিক শ্রেণীর আরাধ্যা।

অনেকের অভিমত, এটি অত্যন্ত সরলীকৃত সিদ্ধান্ত। পণ্ডিতমহলের পর্যালোচনা— সাপের দেবী বা বিষহরীর উৎস রয়েছে বেদে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ঋগ্বেদের একটি সূক্তের নির্দিষ্ট একটি মন্ত্র বা ঋকের উল্লেখ করেন। এই ঋকে বলা হয়েছে—

ত্রিঃ সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ।
তাস্তে বিষং বি জভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব।। (১।১৯১।১৪)

অর্থাৎ, কাঁখে কলসি নিয়ে মহিলারা যেমন জল নিয়ে যান, একই ভাবে একুশটি ময়ূরী ও সপ্তনরী তোমার দেহ থেকে বিষ অপহরণ করুক।

ওই সূক্তের মূলকথা— অল্পবিষপ্রাণী, মহাবিষপ্রাণী, জলচর অল্পবিষপ্রাণী— দু'রকম দাহদানকারী প্রাণী ও অদৃশ্য প্রাণীদেহকে বিষলিপ্ত করে। সে বিষ বর্ষণ করে যে সাপ, তাদের বধ করে সর্পবাহু, সূর্য, শকুন, অগ্নি, নদী, ময়ূর ও নকুল। এই সূক্তে বিষহরীদেবীর কথাই বলা হয়েছে বলে ভাষ্যকাররা মনে করেন।

একইভাবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬১ সংখ্যক সূক্তে পিতা রুদ্র ও কন্যা উষার কথা বলা হয়েছে। সেটিকেই পণ্ডিতরা পরবর্তীকালের সরস্বতী ও ব্রহ্মা বা শিব ও মনসার কাহিনির উৎস বলে মনে করেন।

ঋগ্বেদের মতোই অথর্ব বেদেও এমন সব মন্ত্র রয়েছে যেগুলিকে মনসা বা বিষদেবতার উৎস বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গত, অথর্ব বেদের 'কিরিতাগিরি' অর্থাৎ সমস্ত বিষের বিজয়ী শব্দটিকেও বিষহরির উৎস বলে অনুমান করা হয়। সব মিলিয়ে বেদেই দেবী মনসার উপস্থিতি রয়েছে বলে অনেকের দৃঢ় ধারণা। বেদের দেবীই পরবর্তীতে লৌকিক দেবীর রূপ নেন বলে অনুমান করা হয়।

শ্রেণী বিভাজন : বেদের গভীরে প্রোথিত যে মনসা দেবীর অস্তিত্বের শিকড়। কালে তিনি চলে এলেন লৌকিক স্তরে, হয়ে উঠলেন দেশের লোকজীবনের অঙ্গ। হলেন নিম্নবর্গের অথবা সাধারণ প্রাকৃত লোকের দেবী। সময়ের আবর্তনে তিনিই আবার রূপান্তরিত হলেন পৌরাণিক দেবীতে। বৈদিক-পৌরাণিক ধারাতেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে তাঁর পূজাপদ্ধতি। সমাজের সর্বস্তরের এক পরমপূজনীয়া দেবী হয়ে উঠলেন মনসা। বলা যায়, এ এক আশ্চর্য সাপ-মই লুডোর খেলা।

এই আশ্চর্য মুগ্ধতার আবির ছড়ানো রয়েছে হিন্দুর সাকার সাধনার প্রতিটি স্তরেই। এই মুগ্ধতা এবং এক ধরনের আধ্যাত্মিক ভাবনার বাতাবরণেই হিন্দুর দেব-দেবীর রূপ বিমূর্ত হয়ে উঠেছে তার শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও। এই ভাবনা থেকেই বেদের দেবদেবীরা বিভাজিত হয়েছেন তিনটি শ্রেণীতে। এই তিন কোটি বা তিন থাকের দেবতারা চিহ্নিত হয়ে আছেন ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের দেবতা হিসেবে।

এই তিন কোটির দেবতাদের অন্যভাবেও শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। এই

বিন্যাস অনুযায়ী হিন্দু দেবদেবীদের তিনটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যথা— বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতা। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক দেবতাদের বেশিরভাগই এখন পূজিত অন্য নামে। অন্যদিকে, লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে অনেকেই যুগের বিবর্তনে ঠাঁই করে নিয়েছেন পৌরাণিক স্তরে। দেবী মনসার ক্ষেত্রে কিন্তু এই রূপ-রূপান্তর ঘটেছে— তিনটি স্তরেই। আর তারই মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনে দেবী মনসার গুরুত্ব বা প্রভাব অনুমান করা যায়।

সরস্বতী থেকেই মনসা : বৈদিক দেবীই কালান্তরে মনসায় রূপান্তরিত হন বলে অনুমান করেন অনেকে। ঋগ্বেদে উল্লেখ রয়েছে সরস্বতী এবং শ্রীদেবীর। বেদের ইলা ও ভারতী অন্য কোনো দেবী নন, এঁরা সরস্বতীরই এক রূপ। সরস্বতী ও শ্রী-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অরণ্যানী ইত্যাদি নানা দেবী। একসময় বাস্তুনাগও যুক্ত হয়ে পড়েন সরস্বতীর সঙ্গে।

অন্য কথায়, এক তিনি বহু হলেন। আবার বহু তাঁরা যুক্ত ছিলেন একেই। একারণেই, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে একের মধ্যে বহুর অবস্থান ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। পরবর্তীতে সেই বহু থেকে আবার পৃথকীকরণ। অনেকটা যেন— নানা রং, গন্ধ ও আকারের ভিন্ন ভিন্ন ফুল চয়ন করে তৈরি করা একটি পুষ্পস্তবক বা ফুলের তোড়া, তা থেকে ফুলগুলিকে আলাদা করার মতো ব্যাপার।

অনেকটা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মেই এক সময় বহু গুণ সমন্বিত মূল দেব ও দেবী, আবার পৃথকীকরণের সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবী হিসেবে প্রতিভাত হতে থাকেন। এই ধারাতেই সরস্বতী ও শ্রী এক হলেও দুই পৃথক দেবী— মনসা ও লক্ষ্মী রূপে বিকশিত হন। অবশ্য এই বিভাজনের আগেই নাগপূজা যুক্ত হয়ে পড়েছিল সরস্বতী ও শ্রী-র সঙ্গে। আর সেই কারণেই পৃথকীকরণের পর্বেও তাঁরা কিন্তু আগের বিষয়গুলি আত্তীকরণ করে নেন। আর তারই ফলে সরস্বতী ও শ্রী পৃথক হওয়ার সময় পরবর্তীতে যুক্ত নাগদেবতাদের মধ্যে সর্পগণ মনসার সঙ্গ নিলেন এবং হস্তীনাগ পড়লেন লক্ষ্মীর ভাগে।

ভাগ হলেও মনসা ও লক্ষ্মীর মধ্যে কিন্তু রয়ে গিয়েছে বেশ কিছু মৌলিক সাদৃশ্য। যেমন দু'জনেরই অন্য নাম কমলা ও পদ্মা। পদ্মপাতায় জন্ম তাই মনসা হলেন পদ্মা। আর কমলার আসন পদ্ম, একারণেই মনসা হলেন পদ্মাবতী আর কমলা পদ্মাসনা। মিল আরও আছে। অযোনিসম্ভবা নিজকন্যা সরস্বতীকে কামনা করেছিলেন স্রষ্টা ব্রহ্মা, আর মনসাকে কামনা করেন পিতা শিব। সরস্বতী ও মনসা দু'জনেই একরকম অনাথ। সরস্বতীর সঙ্গে বিবাহ হয় বিষ্ণুর। কিন্তু সে যেন না হওয়ার মতো। সরস্বতী আগাগোড়াই স্বাধীন। অন্যদিকে মনসার সঙ্গে জরৎকারুর বিবাহও ছিল নামেই মাত্র। তিনিও সারা জীবন— একা ও স্বাধীন।

সরস্বতী বিদ্যার দেবী আর মনসা প্রথমে বাক্ এবং পরে মূর্তিমতী বিষবিদ্যা। সরস্বতী গীত ও বাদ্যের দেবী আর মনসা গীতবাদ্যপ্রিয়া। গান বাজনা না হলে যেন শেষ হয় না দেবী মনসার পূজা। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে মনসার রোষে নিহত লখিন্দরের প্রাণ ফেরানোর জন্য বেহুলা মৃত স্বামীর অস্থি নিয়েই নৃত্যের ছন্দে ও ভঙ্গিমায় মূর্ত হয়ে মুগ্ধ করেন মনসা ও দেবতাদের। ফিরে পান স্বামীর প্রাণ। এইভাবে নানা মৌলিক বৈশিষ্ট্যে তাঁরা যেন একাকার। পৃথক হয়েও যেন এক। বৈদিক দেবী থেকে পৌরাণিক দেবী হওয়ার অভিযাত্রায় তাঁরা একে অপরের সহযাত্রী— সাহায্যকারিণী। আর এর থেকেই অনুমান— বেদের সরস্বতীই রূপান্তরের যাত্রায় হয়েছেন দেবী মনসা।

মনোভব তাই মনসা : বেদে তিনি ছিলেন বিমূর্ত, পুরাণে এসে তিনি হলেন মূর্ত। পুরাণে মনসার জন্ম অথবা উৎপত্তি সম্পর্কে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি।

দেবী ভাগবতের কাহিনি (৯।৪৭), সাপের উৎপাতে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ ছুটে যান প্রজাপতি কশ্যপের কাছে। কশ্যপ তাদের নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁর নির্দেশে সর্পভয় নিবারণী মন্ত্র রচনা করেন। সেই সময় কশ্যপের মন থেকে উদ্ভব হয় মনসার।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে (নবম অধ্যায়) বলা হয়েছে— প্রজাপতি কশ্যপ পত্নী কদ্রুর গর্ভে সমস্ত তপস্বিনীর শ্রেষ্ঠা, মহাতেজস্বিনী কন্যা মনসার জন্ম হয়। দেখামাত্র তাঁকে লক্ষ্মী বলে মনে হয়। নারায়ণ অংশসম্ভূত জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহ হয় মনসার। আস্তিক তাঁদেরই পুত্র। তাঁর নাম করলেই দূর হয় সর্পভয়।

ব্রহ্মবৈবর্তের প্রকৃতি খণ্ডের (৪৬ অধ্যায়) কাহিনি অনুযায়ী কশ্যপের মন থেকে জাত মনসা কৈলাস পর্বতে গিয়ে দীর্ঘ দিন মহাদেবের আরাধনা করেন। তুষ্ট মহাদেব তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করলে মনসা পুষ্করতীর্থে কৃষ্ণের তপস্যা করেন সুদীর্ঘকাল। তিন যুগ ধরে ধ্যান করে মনসা সিদ্ধ হলে ভগবান শ্রীহরি আবির্ভূত হয়ে নিজে এবং অন্যান্যদের পুজো করে বলেন— 'তুমি ত্রিজগতের পূজ্যা হও'।

এরপরের ঘটনা একই রকম। মহামুনি জরৎকারুর সঙ্গে কন্যা মনসার বিয়ে দেন মহর্ষি কশ্যপ। পুত্র আস্তিকের জন্মের পরই জরৎকারু তপস্যার জন্য চলে যান।

তক্ষক দংশনে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র জনমেজয় সর্পনিধন যজ্ঞ শুরু করলে মনসার নির্দেশে আস্তিক সেখানে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র-সহ তক্ষক ও অন্যান্য নাগদের বাঁচান এবং জনমেজয়কে যজ্ঞ থেকে বিরত করেন। আস্তিকের জন্য প্রাণে বেঁচে ইন্দ্র দেবী মনসার পূজা করেন এবং আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি বা নাগপঞ্চমী তিথিতে মর্ত্যে মনসাপূজার প্রবর্তন করেন।

শান্তমূর্তি মনসা : দেবী মনসা। সরস্বতীর মতোই শান্ত মূর্তি। দেবীর রূপকল্পনায় এক ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে যে মনসা হলেন 'দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাম্। হংসারূঢ়ামুদরামরুণিত বসনাং সর্বদা সর্বদৈব'— অর্থাৎ যিনি সর্পমাতা, চন্দ্রবদনা, সুকান্তিময়ী, হংসবাহিনী। উদার

তাঁর স্বভাব। তিনি রক্তাম্বরা। তাঁকে ঘিরে রয়েছে অষ্টসাপ। সমস্ত রকম অভীষ্টপ্রদায়িনী দেবী সহাস্য বদনা। নানারকম মণিমুক্তাপ্রবাল মণ্ডিত নানা কনকাভরণে তিনি বিদ্যুতের মতোই উজ্জ্বল। তিনি ইচ্ছামতো যে কোনো সময় যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন।

অন্য এক ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে— 'শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণ ভূষিতাম্ বহ্নিশুদ্ধাংশুকাঙ্গীনাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্', অর্থাৎ সাদা চাঁপার মতো তাঁর গারে রং, নানা রত্নালংকারে ভূষিতা দেবীর যজ্ঞোপবীত হিসেবে জড়িয়ে রয়েছে একটি সাপ ইত্যাদি।

এর অর্থ মনসা কোথাও লোহিতবর্ণা, আবার কোথাও শ্বেতচম্পকবর্ণা। তিনি সমৃদ্ধি, প্রজনন ও বিবাহের দেবী বলে সু-অলংকৃতা।

ধর্মপূজা বিধানে তিনি শঙ্করপুত্রিকা, পদ্মোদ্ভবা ও জাঙ্গুলী। তিনি সর্বসিদ্ধিপ্রদা, সর্পবিষহারিণী। কখনও তিনি দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা। তবে চতুর্ভুজা মূর্তিরই আধিক্য বেশি। দ্বিভুজা মূর্তির একটি হাত ফলাঙ্গুলিবদ্ধ, অন্য হাতে আবদ্ধ শিশুপুত্র আস্তিক।

দেবী মনসা হাঁস বা পদ্মে উপবিষ্টা। তাঁর ওপরের দুটি হাতে থাকে প্রিয় ফুল পদ্ম। নীচের দু'হাতে সাপ ও বরাভয়। মাথার পিছনে ছাউনির মতো ফণা বিস্তার করা সাতটি সাপ।

আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমীর অপর নাম— নাগপঞ্চমী। ওইদিন হয় নাগমাতা মনসার বিশেষ পূজা। অনেক জায়গায় শুক্লা পঞ্চমীও পালন করা হয় নাগপঞ্চমী হিসেবে। শ্রাবণ ও ভাদ্র সংক্রান্তিতে এবং ভাদ্রের কৃষ্ণাপঞ্চমীতেও হয় দেবী মনসার বিশেষ পূজা। ভাদ্র সংক্রান্তি আবার অরন্ধনেরও দিন। স্মৃতিকার রঘুনন্দনের নিদান— কৃষ্ণাপঞ্চমীতে দেবী জাগ্রত হন। তাই এই পূজার ব্যবস্থা।

মঙ্গলকাব্যে মনসা : লৌকিক স্তর থেকে পৌরাণিক দেবদেবী হিসেবে তাঁরা হিন্দুদের আরাধ্যে পরিণত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে দেবী মনসা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণময়। বিভিন্ন কারণেই। দেবী মনসার মূল রয়েছে বেদে। তবুও বৈদিক দেবতা হিসেবে সেসময় আলাদা ভাবে প্রতিষ্ঠা পাননি দেবী মনসা। এমনকী পৌরাণিক দেবীর মর্যাদা পাওয়ার আগেও দেবী মনসাকে আপন মহিমা প্রতিষ্ঠায় অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশ জুড়ে দেখা দিয়েছিল তীব্র আলোড়ন। আর সেই আলোড়নেরই ফসল মনসামঙ্গল কাব্যগুলি। বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে বঙ্গদেশে যেসব বিশেষ সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলি কেবল অনন্য নয়, তা একটি জাতির সামাজিক বিবর্তনেরও উপাদান হিসেবে অতি মূল্যবান। মনসামঙ্গল কোনো নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সাধারণ সংগ্রাম নয়, এটি একটি বিরাট সামাজিক বিপ্লবেরও দলিল।

বাঙ্গলায় মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যই মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে প্রাচীন। একথাই বলেন বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসকাররা। মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি কানাহরি দত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের শেষ বা চতুর্দশ শতকের প্রথমের কবি। অনুমান মনসামঙ্গল কাব্যের সূচনা হয় রাঢ়বঙ্গে। পরে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গেও এই ধারা ছড়িয়ে পড়ে। জনপ্রিয়ও হয়।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন— খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতকেই বঙ্গদেশে মনসা পূজার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। অন্য দিকে, দেবী ভাগবত বা ব্রহ্মবৈবর্তর মতো পুরাণে মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে রচিত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তার থেকে বলা যায় যে বঙ্গদেশে মনসা পূজার ব্যাপক প্রচলনের সময় তা ছিল লৌকিক দেবীর পূজা। পরে তা পৌরাণিক দেবীর পূজার মর্যাদা পায়।

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যগুলি গড়ে ওঠে মূলত চাঁদ সওদাগর ও দেবী মনসার সংঘাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চাঁদ সওদাগর ছিলেন শৈব। অনুমান, সে সেময় সমাজে ছিল বণিকদের আধিপত্য। তাঁদের স্বীকৃতি পেলেই সমগ্র সমাজে তাঁর পূজার প্রচার সম্ভব হবে বলেই দেবী মনসা চাঁদের ওপর নানা চাপ সৃষ্টি করেন। সমাজ তাঁর সহায় হন চাঁদের স্ত্রী সনকা এবং কনিষ্ঠ পুত্রবধূ বেহুলা। বস্তুত বেহুলার অসাধারণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত চাঁদ নেহাত অনিচ্ছাতেও মনসা পূজা করতে বাধ্য হন। আর তারপর থেকেই মনসা পূজা সমাজের ওপরতলাতে ঠাঁই করে নেয়। সংক্ষেপে এটিই হলো পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের কাহিনি।

প্রসঙ্গত, বঙ্গদেশে মনসা পূজার ব্যাপক প্রচলন হলেও দেবী মনসার উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি রয়েছে হরিদ্বার, চণ্ডীগড়ের পঞ্চকুলা, ঝাড়খণ্ডের বান্দ্রা, ছত্তিশগড়ের বান্ধাবাজার, রাজস্থানের আলোয়ার, পঞ্জাবের ধুরি, বিহারের সীতামারি, উত্তরপ্রদেশের মথুরা, মীরাট, অন্ধ্রের মুক্কামালা, কুরনুল, নেলোর ইত্যাদি স্থানে। দুই বঙ্গেও সব মিলিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি মন্দির।

সংস্কৃতিরও অঙ্গ : মূলত সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্যই মনসা পূজার আয়োজন হয় এত ব্যাপক ভাবে। সাপের উৎপাত যে এদেশে বহুদিন থেকেই চলছে তার প্রমাণ পূজ্যসূত্রের নিদান থেকেও। সেখানে শ্রাবণের পূর্ণিমা থেকে অঘ্রানের পূর্ণিমা পর্যন্ত মাটিতে শুতে বারণ করা হয়েছে।

দেবী মনসা সম্পর্কিত নানা কাহিনি এবং পূজার নিয়মনীতি থেকে স্পষ্ট— বঙ্গদেশে অন্তত তাঁর পূজন কোনো ভীতির কারণে নয়, তার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রগমন এবং পরিপুষ্টির বিষয়টিও। মনসাপূজা এখনও বিশেষ করে পল্লীসমাজের এক নজরকাড়া বিষয়। শুধু ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দেবী মনসা এবং তাঁর পূজা বঙ্গের এক আত্মিক অনুষ্ঠান। ◻

বাংলা সাহিত্যে ও লোকসাহিত্যে সর্প-সংস্কৃতি ও সর্পবৈচিত্র্য

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় দেবী মনসা লৌহবাসরে লখিন্দরকে দংশন করতে রাত্রের এক এক প্রহরে একে একে বিবিধ জাতের সাপ পাঠাচ্ছেন। কিন্তু কেউই সফল হচ্ছে না। শেষে কালনাগিনী সে কাজে সচেষ্ট ও সফল হলো। রেভারেন্ড লালবিহারী দে লিখিত 'Bengal Peasant Life' এবং লীলা মজুমদার অনুদিত 'গ্রাম বাঙ্গলার উপকথা'য় সর্প-সংস্কৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। দুই ক্ষেতের মধ্যিখানে আলের উপর দিয়ে গয়ারাম চলেছে; এমন সময় তিন হাত লম্বা এক কালকেউটে নিমেষের মধ্যে খাড়া হয়ে উঠেই ওকে তাড়া করল। পালাবার এতটুকু সময় পেল না বেচারি। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কবজির ওপর একবার দাঁত বসিয়েই ফণা তুলে আবার ছোবল দিল। কালামানিক কাছেই ছিল; ছুটে এসে পাঁচনের এক বাড়িতে সাপের দফা শেষ করে দিল। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। গয়ারাম মাটিতে শুয়ে পড়ল।

বদন দৌড়ে এসে কাটা জায়গাটার ওপরে শক্ত করে গামছা বেঁধে দিল। তারপর কালামানিক আর বদন গয়ারামকে তুলে বাড়ি নিয়ে এল। বাড়ির মেয়েরা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। পাড়ার লোকেরা আর গ্রামের যারা খবর শুনল, সবাই ছুটে এল। সকলে স্তম্ভিত। অনেকেই সাপের ঈশ্বরী মনসা দেবীকে ডাকতে লাগল। কেউ এক ওষুধ বলে, কেউ আরেক ওষুধ। শেষে ঠিক হলো দু'মাইল দূরের চন্দ্রহাটি গ্রামের নামকরা সাপের বদ্যিকে ডাকা হবে। তাদের বলে 'মাল'। তারা সাপ ধরে, সাপের কামড়ের ওষুধ দেয়। শরীরে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছিল। কখনো গয়ারাম বিষের জ্বালায় চিৎকার করছিল; কখনো-বা নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিল। তখন সকলে তাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। বুড়িরা অনেক রকম ওষুধের কথা বলছিল। তার কিছু কিছু পরীক্ষা করে দেখাও হলো। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না।

তারপর চন্দ্রহাটির মাল এসে চিকিৎসা শুরু করল। কখনো গায়ে মালিশ করে, কখনো মুখে ফুঁ দেয়, কখনো ওষুধ গেলায়। কিন্তু সবই বৃথা। ভোরের আগে গয়ারামের প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

প্রস্তুত প্রবন্ধে সর্প-সংস্কৃতি (Sanke-lore) বলতে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক কৃত প্রতিশব্দ সর্পচারণা বা Serpent-lore বুঝব। সর্প উপাসনা (Snake Worship) এবং সর্প-বাদ (Serpent cult) তারই অঙ্গ। দেশ-বিদেশের সর্পনৃত্য (Snake-dance), সর্প-চিত্র (Snake-ritual art), স্থাপত্য-ভাস্কর্যে সাপের অভিপ্রায় (Snake motif), বিশ্বজুড়ে সাপ সম্পর্কিত নানা বিশ্বাস-সংস্কার-কুসংস্কার-মন্ত্র এবং সর্বোপরি মনসামঙ্গল কাব্যের মতো

ফ ঃ ৫

সর্প-সাহিত্য (Snake-literature)— সব মিলিয়েই সর্প-সংস্কৃতি।

রাণী চন্দ্র লিখছেন ('আমার মা'র বাপের বাড়ি'), 'বর্ষার কাল, চারিদিকে ভরা জল। সাপ ব্যাঙ যত কিছু এসে কত সময়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে আশ্রয়ের আশায়। একদিন এক বিরাট জলঢোঁড়া এসে খাটের নীচে 'বিড়ে' পাকিয়ে আছে; নজরে পড়ল দুদুমামার।...দুদুমামা নিরামিষ ঘরের একখানা পাথরের বড়ো 'খাদা' দিয়ে সেই সাপটা ঢাকা গিয়ে রাখলেন। বড়ো মামিমা রান্না করছিলেন নিরামিষ ঘরে, টকের ডাল ঢালবেন— ব্যস্ত ভাবেই এলেন; এসে 'খাদা' ধরে টান দিয়ে সাত হাত ছিটকে পড়লেন। পরে অবশ্য দুদুমামাই সাপটাকে তাড়ালেন ঘর থেকে।' ওই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি লিখছেন,

'উঠোনের উপর দিয়ে 'গুইসাপ' চলে যায় সরসর করে। অবিকল কুমিরের মতো দেখতে, তবে কুমিরের চেয়ে ছোটো। জলে থাকে, ডাঙ্গায় ঘোরে। জলে মাছ খায়, ডাঙ্গায় সাপ খেয়ে বেড়ায় ঝোপে জঙ্গলে। 'গুইসাপ' উঠোনে উঠে গোল গোল চোখ পাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয় চারদিকটা, দেখেই গা বেঁকিয়ে লেজ আছড়ে বেঁটে বেঁটে পায়ে দৌড়ে পালায়। লম্বা জিভ, সাপের মতো চেরা, লক্ লক্ করে জিভটা মুখে। কোনোদিন হয়তো জঙ্গলে বনে আম, খেজুর, কী আর-কিছু কুড়োতে গেছি— শুনি খস্‌খস্ আওয়াজ, তারপরেই দেখি গুইসাপ একটা মাথা তুলে দেখছে আমাকে। অমনি ছুটে পালিয়ে এসেছি তার ত্রিসীমানা থেকে। দিদিমা বলে দিয়েছেন— 'গুইসাপ যদি লেজের বাড়ি মারে, সেই ঘা শুকোয় না কখনো।' গুইসাপের লেজ কুমিরের মতোই মোটা আর লম্বা।

এই গুইসাপ বা গোধার সঙ্গে দেবী চণ্ডীর সম্পর্ক বর্তমান। এই গোধা সর্পহন্তা এবং মনুষ্যভক্ষক এবং একদা মৃগয়ার প্রাণী ছিল। দেবীর অস্ত্র হিসেবে কোথাও কোথাও গোধাকে দেখানো হয়েছে। যেমন পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন বিদিশার অদূরবর্তী উদয়গিরি পর্বতের গুহাগাত্রে গো-সাপ অস্ত্রে সজ্জিতা দেবীমূর্তি অঙ্কিত হয়েছিল। কবিকঙ্কন বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় দেবী গোধারূপ ধরে কালকেতুর গৃহে এসেছে এবং তাকে ধন দান করেছে। 'পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা/ততক্ষণে সুবর্ণ গোধিকারূপ হইলা।'

বাস্তুসাপ বা গৃহদেবতা রূপে দুই পৃথক পৃথক সাপের বিবরণ দিয়েছেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ('রাজসাপ' নামক ছোটো গল্পে) এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরী ('ব্যাঘ্রমঙ্গল' নামক ছোটো গল্পে)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনি' উপন্যাসে সর্প-অভিপ্রায় (Snake Motif) পরতে পরতে উপলব্ধ। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে চাঁদ বেনে ও সাঁতালী পাহাড়ের ধন্বন্তরির বন্ধুত্ব ও মন্ত্রশক্তির কাহিনি দিয়ে। হিজল বিলে মা মনসার আটন। পদ্মাবতী পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাতডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এখানে এসে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এখানেই বেঁধেছে বাসা। এরই তীরে বাস করে বেদের দল, সাঁতালীর বিষ বেদে। ভাদ্র মাসের শেষে নাগপঞ্চমীতে বিষবেদেরা যে মা মনসার গীত গায় তার উল্লেখ আছে উপন্যাসে।

তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন মাঝরাতের এক বিশেষ ক্ষণে যখন শেয়াল ডাকে, কালো বাদুড় উড়ে যায়, পেঁচা ডানা ঝাপটায় তখন নাগিনী কন্যার অন্তরের মধ্যে বসবাসকারী কালনাগিনী আপন স্বরূপ নিয়ে জেগে ওঠে, তাদের প্রবৃত্তি উগ্র হয়ে ওঠে। এ সময় নিজেকে না বাঁধলে, বিছানার খুঁট ধরে দাঁতে দাঁত টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে না থাকলে চরম সর্বনাশ হয়। তারা উন্মাদের মতো নিশীথ রাতে হিজলে ঘাসবনে ঘুরে বেড়ায়, আর বাঘ কিংবা কুমিরের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারায়। তাই বিষহরির নাম জপ করে, চুল বেঁধে, এঁটে সেঁটে নতুন করে কষে কাপড় পরে অন্তরের নাগিনীর চোয়াল টিপে ধরে অন্তরের ঝাঁপিতেই কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সর্পাঘাতের জড়ি-বুটি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসকে অলৌকিক বিশ্বাসের উপকথা শুনিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন—

'...বুলি শোন, এ যে কি গাছ তার নাম আমরাও জানি। বেদেরা বলে সেই যখন সাঁতালী পাহাড় থেকে বেদেরা ভাসল নৌকোতে, তকুন ও কালনাগিনী কন্যে যে আভরণ অঙ্গে পর‍্যা নেচেছিল, তাতেই একটুকরো মূল ছিল লেগে। সাঁতালী ছাড়ল বেদেরা। সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির বিদ্যা চাঁদা বেনের অভিশাপে হলো বিস্মরণ। নতুন বিদ্যা দিলেন মা বিষহরি। এখুন ধন্বন্তরির বিদ্যার ওই মূলটুকুই কন্যার আভরণে লেগে সঙ্গে এল, তাই পুতলে শিরবেদে নতুন সাঁতালী গাঁয়ে হিজল বিলের কূলে। গাছ আছে, শিকড় নিয়া ওষুধ করি, কিন্তু নাম তো জানি না ধরম ভাই। আর ই গাছ সাঁতালী ছাড়া তো আর কুথাও নাই পৃথিবীতে। তাহলে তুমাকে নাম বলব, কি গাছ চিনায়ে দিব কি কর‍্যা কও? এইটি তুমি রাখ, লাগ যদি ডংশন করে আর সি ডংশনের পিছাতে যদি দেব রোষ কি ব্রহ্ম রোষ না থাকে তবে ইয়ার এক রতি জলে বেঁট্যা গোল মরিচের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিবা, পরানডা যদি তিল পরিমাণ থাকে তবে সে পরাণকে ফিরতে হবে, হাসতে হবে, পহরের মধ্যে মরার মতো মনিষি চোখ মেলে চাইবে।'

মানভূম অঞ্চলে সাপের আক্রমণ থেকে ছোটো ছেলে-মেয়েদের রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়ে গৃহিণী আশ্বিন সংক্রান্তিতে জীহড় ব্রত পালন করে। এই দিনটিতে সাপেরা গর্তে লুকিয়ে পড়ে বলে মানভূমের লোকসাধারণের বিশ্বাস। এদিন ধানের ক্ষেতে ষষ্ঠীর পূজা হয়। 'জীউ' শব্দের অর্থ বাঁচা আর 'হড়' মানে মানুষ। অর্থাৎ সর্প দংশনের হাত থেকে বাঁচানোর ব্রতানুষ্ঠান হচ্ছে জীহড় ব্রত। মানভূমের মানুষ বিশ্বাস করে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ অর্থাৎ রোহিণী দিনে সাপেরা পুনরায় গর্ত থেকে বের হয়। জীহড় দিনে নাগমাতা মনসা দেবীর নামে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার রীতি আছে তুলসী মঞ্চের সামনে। জীহড় রাতে বিছানার শিয়র দেশে রাখা হয় 'ভুজঙ্গ নিবারণী লতিকা' যা অযোধ্যা ও মাঠা বনাঞ্চলে এবং গজবরু পাহাড়ের সানুদেশে পাওয়া যায়।

সাপ নিয়ে গড়ে উঠেছে নানান লোকবিশ্বাস ও কিংবদন্তি। এর অন্যতম হচ্ছে

সাপের মাথার মণি। এ অনেকটা 'গজমোতি'-র মতোই মিথ্যে! তবুও সর্পসাহিত্যে তার রসাস্বাদনে রোমাঞ্চ কিছু কম নয়। বঙ্গের প্রবাদবাক্য 'মণিহারা ফণি' সেই বিশ্বাসের আলোকেই তৈরি। বলা হচ্ছে, কমপক্ষে এক লক্ষ কেঁচো খেয়েছে যে শালিক তাকে যদি কোনো বৃহদাকার ব্যাং খায়, আবার সেই ব্যাংকে যদি কোনো সাপ খায়, তবে সে সাপের মাথায় জন্মাবে বহুমূল্য মণি। সাপ নিজের মণি খুলে তার আলোকে ব্যাংকে আকৃষ্ট করে। কোনো কারণে মণি হারালে সাপ মাথা কুটে মারে— তাই হলো 'মণিহারা ফণি'র শোক। 'মণি' কল্পনার পশ্চাতে ফসফরাস নামক মৌলের ঔজ্জ্বল্যের ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সাপকে কুলপ্রতীক বা Totem মনে করবার ফলেই দৈবাৎ সর্পহত্যা হয়ে গেলে তাকে দাহ করতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন সাপ হচ্ছে 'ব্রাহ্মণ', সেজন্যই দাহ করতে হয়। এমনকী দাহ করবার শেষে প্রণামও করা হয়। এই সংস্কারের পশ্চাতে সাপের বিষ পুড়িয়ে নষ্ট করবার উদ্দেশ্যই মূল ক্রিয়াশীল বলে মনে করা যেতে পারে।

সাপকে বলা হয় 'চক্ষুশ্রবাঃ' অর্থাৎ যে চোখ দিয়ে শোনে। সাপুড়েরা বাঁশি বাজিয়ে দুললে সাপও ফণা সহকারে দোলে--- এভাবে লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করার প্রয়োজনেই তার ফণা দুলতে থাকে। সাপকে 'বায়ুভুক' বলা হয়, তার কারণ গোটা শীতে তার hybernation বা শীতঘুম। সাপের সম্মোহনী শক্তি আছে বলে যে লোকবিশ্বাস আদতে তা সত্যি নয়। কালীয়কে দমন করতে শ্রীকৃষ্ণ তাকে পদাঘাত করেছিলেন তাই পদ্মগোখরোর ফণায় শ্রীকৃষ্ণের পায়ের নূপুরের চিহ্ন— এটা মিথোম্যানিয়ার ফল বলে মনে করা হয়। সাপ সম্পর্কিত আরও অনেক লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন— বাসুকি সর্প পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, তার ফণা বদলের জন্যই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সঙ্গমরত বা 'শঙ্খলাগা' সাপকে নববস্ত্র পেতে দেওয়াও একটা বিশ্বাস। বিশ্বাস, শঙ্খলাগা সাপ যদি সেই বস্ত্র স্পর্শ করে তবে তা পরিধানে সর্ব মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

নির্মলেন্দু ভৌমিক (১৪০৬) সর্প-দেবী মনসার বিবর্তনের কথা জানিয়েছেন, সাপ প্রথমে Zoomorphic বা মানবেতর প্রাণীরূপে সর্পমূর্তিতে পূজিত হতো, পরে Anthropomorphic বা মনুষ্য-মূর্তির মনসা দেবীর উদ্ভব হলে সাপ তাঁর বাহন হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের মনসাঘট বা পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের মনসাচালির মধ্যে সেই ইতিহাসের ভগ্নাংশ (Missing Link) নিহিত আছে। মনসাঘটে দেবী মনসার মুখমণ্ডলটুকু মেলে (Theriomorphic), মনসাচালিতে মনুষ্যরূপই অনুপস্থিত (Zoomorphic)। অর্থাৎ বর্তমানে দেবী মনসা পরিপূর্ণ মানবী মূর্তিতে এবং সমান্তরালে মানবেতর প্রাণীরূপে সর্পাকৃতিতে (সর্পমুণ্ডের সমাহারে) পূজিতা হচ্ছেন। 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণে রয়েছে দেবী মনসার উদ্ভব প্রসঙ্গ— ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপমুনি সর্পমন্ত্রসমূহ সৃষ্টি করলেন। তারপর তপোবনে মনদ্বারা যে দেবীকে উৎপাদন করে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে স্থাপন করলেন, তিনিই মনসা। মনসা হচ্ছেন বাসুকির ভগ্নী, জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিকের মাতা। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অষ্টনাগ সমেত দেবী মনসাকে পশ্চিমবঙ্গে মর্তমান কলা-দুধ, পূর্ববঙ্গে শব্রীকলা-দুধ এবং উত্তরবঙ্গে মালভোগ কলা-দুধ দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। পদ্মাপুরাণ অনুধ্যান করলে দেখা যায়, মনসা পদ্মাসীন, তাই পূর্ববঙ্গে মনসাকে বলা হয় পদ্মা। উত্তরবঙ্গে মনসা যুগল হংসাসীনা, বরাভয়দাত্রী শান্তরূপিণী, মানবীমূর্তিতে তিনি অবতীর্ণা। বহুফণাযুক্ত এক কাল্পনিক/পৌরাণিক সাপ যেমন মনসার প্রতীক, তেমনই ফণিমনসা বা মনসাসিজ গাছও মনসার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

বিষ্ণুর শক্তি হিসেবে লক্ষ্মী এক সময়ে গরুড়কে বাহন করেছিলেন বলে জানা যায়। কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত তোরমানের সিলমোহরে লক্ষ্মীর পদতলে গরুড়; ইলোরার গুহাচিত্রে গরুড় বাহনা লক্ষ্মী, মার্কণ্ডেয় পুরাণভাষ্যানুসারে শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারিণী গরুড়বাহনা বৈষ্ণবীর রূপ-কল্পনা স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে সর্প-উপাসনার প্রাধান্য লাভ এবং মনসামঙ্গল কাব্য জনপ্রিয় হওয়ার সমসাময়িককালে গরুড়ের মতো সর্পখাদক কাউকে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। যেহেতু গরুড়= ঈগল + মানুষের রূপকল্পনা, তাই ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঈগলের সদৃশ প্যাঁচাকে লক্ষ্মীর পদতলে স্থান দিতে হলো। গরুড়ের যে সর্পখাদক হিসেবে পরিচিতি আছে, ভারতচন্দ্রে অন্নদামঙ্গলেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়--- 'উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।/বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে।।/নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়।/সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়।'

আলপনায় সাপ উর্বরতার প্রতীক। সাপের উপস্থিতি দ্বিবিধ--- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে সাপের অবয়বগত বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। পরোক্ষ ক্ষেত্রে সর্পিল লতায় সাপের উপস্থিতি। ধানের গুছি বা মরাইয়ের ছবির পাশে সাপের চলার চিহ্নের মতো যে ছবি আঁকা হয় তার মধ্যে অনুকরণাত্মক জাদু ফুটে ওঠে। সাপের বংশবিস্তারের অনুরূপ উর্বরতা কৃষিক্ষেত্রেও আসুক--- এই প্রার্থনা। লোকবিশ্বাস গর্ভাবস্থায় নারী স্বপ্নে সাপ দেখলে তার পুত্রসন্তান লাভ হবে। দুই সাপের মিলনকালে একটি বস্ত্রখণ্ড কায়দামাফিক ছুঁড়ে দিলে যদি সেটিতে সাপ দুটির ছোঁয়া লাগে তবে সে কাপড়টি পয়মন্ত হয়। ইঁদুরও দ্রুত বংশবিস্তারক। তবে তার ছবি আঁকা হয় না কেন? কারণ ইঁদুর ফসলের ধ্বংসাত্মক শক্তি— 'অলক্ষ্মী'। ইঁদুর দমন করে সাপ, সুতরাং সাপ হাজির হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। সাপ ছাড়া সরীসৃপ গোত্রের কুমিরের চিত্রও আঁকা হয়। ভাদুলী ব্রতের আলপনায় ব্রতিনীর জলযাত্রী বাপ-ভাই যাতে নদী-সমুদ্রের কুমিরের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পায় সেজন্যও কুমিরের ছবি আঁকা হয়।

সুভাষ মিস্ত্রী (২০০০) জানাচ্ছেন, সাপজনিত মন্ত্র দুই ধরনের— সর্প বশীকরণ ও সর্পাঘাত চিকিৎসা। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচলিত যে ৬৪ কাহন সর্পাঘাত জনিত মন্ত্র রয়েছে, তার মধ্যে ব্রহ্ম চাপড়, আপন সার, বন্ধন, বিষ বন্ধন, তাগা বন্ধন, আসর বন্ধন, জ্ঞান কয়েদ, হুলঝরা, থালা পড়া, বান কাটা, জলসার, জাপান, উড়ন, অগ্নিসার ইত্যাদি প্রধান। সাপ বশীকরণ বলতে সাপকে জীবন্ত ধরা, পোষ-মানানো, সাপ খেলা প্রভৃতি

বোঝায়।

'হাতচালা' মন্ত্রের সাহায্য গুণিন বোঝেন সাপের বিষ শরীরে কতটা বিস্তার লাভ করেছে। বাম হাতের তালু মাটিতে অবস্থান করে সাত বার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেন গুণিন : 'হাতচানভি হাত চলে— /অচল চলে সচল চলে/মনসা চলে মহাদেব চলে।।/ভূত চলে মাটি চলে/গঙ্গা চলে যমুনা চলে/এ হাতে বিষ চলে।।/ চল চলরে হাত তাড়াতাড়ি চল—/দোহাই তোমার রাম সীতার দোহাই লাগে/মা মনসার আজ্ঞা লাগে।'

মন্থন মন্ত্রে মনসা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে সাপে কাটা রোগীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে অথবা নিম-হেন্নার ডাল বুলিয়ে তিনবার মন্ত্র পড়েন ওঝা। দীর্ঘ এই মন্ত্রটি কাহিনিমূলক, উক্তি- প্রত্যুক্তিমূলক।

'মন্থনে মাতিল গোঁসাই কিবা কবে কথা।/মন্থনে উপজিল বিষ হস্তি মামূড় মাথা।।/সেই বিষ মহাপুরুষ খায় এক থাল।/বুক বেয়ে পড়ে তার গোটা গোটা নাল।।/ না দিল কার্তিক, গণপতি, দুর্গা, না দিল কোল।/কালিনী বিষের জ্বালায় হরে নিল বোল।।...'

'হুল ঝরা' মন্ত্রে সাপের দাঁত ক্ষতস্থানে আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে লম্বা চুল নিয়ে তার দুই মাথা ক্ষতস্থানের উপর ধরে উপর-নীচ করে টানতে হয়। 'বিষ বন্ধন' মন্ত্রে ওঝা নিজের কাপড়ের খুঁটে গিট দিয়ে বিষ বন্ধন করে, যেন রোগীর বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে না পড়তে পারে। 'বিষ চালা' মন্ত্রের সাহায্যে রোগীর শরীরের সমস্ত বিষ ক্ষতমূলে নিয়ে আসে গুণীন। বিষচালা মন্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

'ওরে আল্লা কি করিলি ওরে/ঘা চাইতে মুখ ঘা মুখেতে মরে/ সাপের নাম মোহন কলা বিষের নাম ফণি/মা মনসার স্মরণে বিষ হয়ে খাওরে পাণি/আচাল চালি সুচাল চালি কণ্ঠ দেবী তোমায় চালি/ হাড়েতে-হোড়েতে চালি চৌষট্টি বিষ চালি।/ শোনরে বিষ আমার বচন/আগোম-পুরাণের কথা শোন দিয়া মন।।/যে শিব সেই শিব সর্বলোকে জানে/আঘাতে খামারের বাণ সর্বলোকে মানে।।/আঘাতে খামারের বাণ নরগঙ্গার ধারে/হাড়ে যাতে হাড়ে মর/রক্তে থাক রক্তে মর।/সঙ্গে থাক সঙ্গে মর/যে স্থলে ধরিতে বিষ সেই স্থলে মর।/আয় চন্দ্র মোহিনী বয় চন্দ্রগুরু/আমার এই হুকুম যদি নড়ে/শিবের জট কেটে ভূমিতে পড়ে।/ কার আজ্ঞে— দোহাই মা মনসার আজ্ঞে/শীঘ্র শীঘ্র করে লাগলে।।'

সরীসৃপ-সহ বিবিধ বিষধর প্রাণীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম অন্নদামঙ্গলে—

'কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সুঁচে ব্রহ্মজাল।।
শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার।
খড়ী চোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।।
তক্ষক উদয়কাল ডাড়াশ কানাড়া।
লাউডগা, কাউশার কুয়ে বেতাছাড়া।।
ছাতারে শীয়ড় চাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটিনী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।।

দেখা যাচ্ছে কেউটে, খরিশ, ময়াল, বোড়া চিতি বা চিতিবোড়া, শঙ্খচূড়, শাঁখিনী বা শঙ্খিনী, তক্ষক, ডাড়াশ, কানাড়া বা কাঁড়সাপ, লাউডগা, বেতাছাড়া বা বেত আছড়া, শীয়ড় চাঁদা বা কালাচ, নানাজাতি বোড়া (চন্দ্রবোড়া, গেছো বোড়া), মেটিলি, পুঁয়ে, হেলে, ঢোঁড়া ইত্যাদি বিষধর প্রাণীর পরিচয় পাওয়া গেল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও সর্প- বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে—

'নিখিল কালিয়া হ্রদে ভুজঙ্গমগণ।
গরল-শেখর কালী লেখে ততক্ষণ।।
নয় বোড়া লিখিল আর ষোল চিতি।
পাতালে বাসুকি লিখে শেষ নাগপতি।।'

বিশ্বে সাপ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩৫০০ যার অধিকাংশই ক্রান্তীয় বনাঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। ভারতে রয়েছে প্রায় আড়াইশো প্রজাতির সাপ। এর মধ্যে ৫২ প্রজাতির কামড়ে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কালাচকে কোনো কোনো অঞ্চলে কালোচিতি, চিতিবোড়া, গোদাচিতি, ডোমনা, ডোমনাচিতি কিংবা শিয়র চাঁদা বলা হয়। অনেকে কালাচ ও চিতি সাপকে গুলিয়ে ফেলেন। কালাচ তীব্র বিষধর কিন্তু চিতি বিষহীন। কালাচের বিষের তীব্রতা এমনই বেশি যে মাত্র এক মিলিগ্রাম বিষ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। শাঁখামুটি, গোখরো, কেউটে, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়া ও গেছোবোড়া সাপের বিপদজ্জনক বিষের মাত্রা যথাক্রমে ১০, ১৫, ১৫, ১২, ৪২ এবং ১০০ মিলিগ্রাম। কালাচ ও শাঁখামুটি অলস এবং শান্ত। গোখরো অতিমাত্রায় সজাগ ও তীব্রগতিসম্পন্ন। কেউটে অত্যন্ত রাগী ও ক্ষিপ্র। আতঙ্কে বা বিরক্তিতে চন্দ্রবোড়া একটানা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে থাকে। গেছোবোড়া সাপ কিছুটা অলস প্রকৃতির। শঙ্খচূড় পাহাড়ি অঞ্চলে কিংবা গভীর জঙ্গলের আর্দ্রস্থান পছন্দ করে। এদেশে শঙ্খচূড়, কেউটে ও গোখরোর মতো বিষধর সাপই কেবল ফণা ধরতে পারে।

বঙ্গের জনজাতিরা নানান ধরনের সাপ ধরে খায়। অনেক জনজাতিগোষ্ঠী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে নতুন বৃষ্টি হলে বন-জঙ্গল, মাঠে-প্রান্তরে খোঁজে ঢ্যামনা সাপ ও গুইসাপ। সাপের গর্ত পর্যবেক্ষণ করেই এরা বুঝতে পারে কী জাতের সাপ আছে। ঢ্যামনা সাপ অতি প্রিয়। ঢ্যামনা শিকার করে এরা চামড়া বিক্রি করে আর বাকিটা পাতার খোলায় গোল করে পাকিয়ে আগুনে ঝলসিয়ে নেয়। তারপর কাঁটা বেছে নুন-লঙ্কা দিয়ে মহানন্দে খায়।

বিষধর সাপ নিশাচর প্রাণী হওয়ায় সন্ধ্যা ও প্রথম রাতে খাদ্যের সন্ধানে সক্রিয় হয়। গ্রামবাঙ্গলায় সমর্থ পুরুষ মানুষকেই সন্ধ্যার পর বাইরে বেরতে হয়। তাই দেখা যায় ২০ থেকে ৩৯ বছর বয়স্ক পুরুষেরা বিষধর সাপের দ্বারা আক্রান্ত হয় সন্ধ্যার পর থেকে মাঝরাতের মধ্যে। যেহেতু সাপের নাগালের মধ্যে মানুষের পা পড়ে তাই শতকরা ৭২টি ক্ষেত্রে পায়ে কামড়ের ঘটনা ঘটে। দুর্গম অঞ্চলে ওঝা গুণিনদের কাছে অনেক লোক মরে। বহু মৃতদেহ সৎকার না করে জলে ভাসানো হয়। নির্বিষ সাপের কামড়েই মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে (শতকরা ৯০ ভাগ)। এই মৃত্যুর কারণ হচ্ছে আতঙ্ক এবং হার্টফেল।

(এই প্রবন্ধে সর্প চিকিৎসায় যে লোকায়তিক পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। সাপে কামড়ালে সরকারি হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।)

দিভিজার শুভ উপনয়নে পুনঃপ্রবর্তিত হলো সুসংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা— প্রাচীন বৈদিক যুগে একাধিক বিদুষীর নাম জানা যায় যাঁরা নারী হলেও তাঁরা ছিলেন বেদের বহু সূক্তের রচয়িতা। এই বিদুষী নারীদের জ্ঞান-দর্শনের আলোকে আলোকিত হয়েছে সমগ্র ভারত। কিন্তু ইসলামি আক্রমণের সময় হিন্দু সমাজের প্রাচীন সুসংস্কার, রীতিনীতি, বৈদিক আচার-বিচার নানাভাবে অদৃশ্য হতে থাকে। ফলে নানা ভেদাভেদের মধ্যে বৈদিক যুগে অনুসৃত আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ও চিন্তাধারা যেন হারিয়ে যেতে থাকে। বৈদিক যুগে উপনয়নের মাধ্যমে বিদুষী নারীদের যজ্ঞোপবীত ধারণের কাহিনি পরিণত হয় প্রাচীন ইতিহাসে।

গত ১১ জুলাই দিভিজার উপনয়নের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো একদা হারিয়ে যেতে থাকা সেই সুসংস্কার। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'কোন শাস্ত্রে প্রমাণ কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হইবে না?' বৈদিক যুগের সেই রীতি ফিরিয়ে আনলেন বেলঘরিয়ায় ক্লাব টাউন গার্ডেন্স নিবাসী দিভিজা রায়ের বাবা বিবেকানন্দ রায় ও মা দেবলীনা রায়। বিবেকানন্দ বাবু রাশিবিজ্ঞানের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। ২০০৩ থেকে তিনি রয়েছেন বিদেশে। ২০০৮ থেকে বিদেশেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনারত। প্রবাসী বাঙ্গালি হলেও প্রতি বছর এই সময়টায় দেশে ফেরেন। তাঁর দুই কন্যা দিভিজা ও দিভিনা। কন্যা সন্তান জন্মের পরেই স্থির করেছিলেন বেদ-উপনিষদ যুগের প্রথা অনুসরণ করে সেই সংস্কার ফিরিয়ে আনবেন। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে গত ১১ জুলাই আর্যসমাজের পণ্ডিতের মাধ্যমে প্রথমা কন্যার উপনয়ন সম্পন্ন করলেন তিনি।

বিবেকানন্দ বাবু বলেন যে সনাতন ধর্মে গর্ভধারণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাত্রার সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে বিবিধ সংস্কার পালিত হয়। উপনয়নের মাধ্যমে বৈদিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন ও অধ্যাত্মজ্ঞান লাভে বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার অধিকার ছিল। এই অনুভূতি থেকেই ঈশ্বরের অনুকম্পায়, পিতৃ ও মাতৃ পুরুষের আশীর্বাদে ও মহাপুরুষদের প্রেরণায় কলকাতায় আমাদের বাসভবনে আমার প্রথমা কন্যা দিভিজার শুভ উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন করতে ব্রতী হয়েছি। তিনি আরও বলেন যে বৈদিক যুগে মেয়েদের পৈতে দেওয়ার চল ছিল। এখন শুধু পুত্র সন্তানের পৈতে হলেও বৈদিক যুগে এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বিভাজন ছিল না। বৈদিক যুগে গার্গী, লোপামুদ্রা, মৈত্রেয়ীর মতো মহিলা ঋষিরাও ছিলেন। এখন উপনয়ন শুধু ছেলেদেরই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেটা কেন হবে? এই ভ্রান্ত ধারণা ও প্রথা ভেঙে এগিয়ে আসা উচিত সকলের। এই প্রসঙ্গে উপনয়ন শব্দের অর্থ অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। উপ অর্থাৎ সমীপে বা কাছে, নয়ন মানে যাওয়া বা উপনীত হওয়া। পৈতে অর্থাৎ উপনয়ন হলো পড়াশোনা বা শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আচার্য সমীপে যাওয়া। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন গোত্র প্রবর্তক। যাঁদেরই গোত্র রয়েছে তাঁরা সকলেই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বংশধর। সেই ঋষি দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রদত্ত শিক্ষা ঋষিকুলজাতকদের সামনে সত্যের দুয়ারকে উন্মুক্ত করে। সেই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই 'সমাজ কী বলবে!'— সেই সব না ভেবে চলতি প্রথা ভেঙে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বিবেকানন্দবাবু। আজকে 'ব্যতিক্রমী' হলেও প্রাচীন ভারতে যা একটি প্রচলিত প্রথা ছিল।

দিভিজার উপনয়নের অনুষ্ঠান শেষের পর ছিল সামান্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা। অধুনা সমাজে প্রচলিত প্রথা ভেঙে এগিয়ে আসা অধ্যাপক বিবেকানন্দ বাবুর প্রথমা কন্যা দিভিজার নামের অর্থ— 'স্বর্গে জাত যে'। শুধু স্বর্গে জন্মগ্রহণ নয়, বাবা-মার অধ্যবসায়, সদ্‌চিন্তায় ও প্রচেষ্টায় এবার দ্বিজত্ব লাভ করলো সে। যজ্ঞোপবীত ধারণের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম পেল দিভিজা। 'দ্বিজা' হলো দিভিজা। ঘটনাচক্রে দিভিজার ডাকনামও দ্বিজা। ভারতীয় সুসংস্কার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দিভিজার দ্বিজত্ব লাভের উদাহরণ সত্যিই অনন্যসাধারণ। আগামীদিনে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিজা হয়ে ওঠার এই বৃত্তান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে। □

গড়ে উঠল রাজধানী

খণ্ডপ্রস্থ। ধু ধু মাঠ। দূরদূরান্ত অবধি কিছুই চোখে পড়ে না। বৃষ্টি হয়নি বহু বছর। এক কোণে রয়েছে গভীর ভয়াবহ জঙ্গল। সেখানে না আছে কোনো খাদ্যের ব্যবস্থা, হঠাৎ তাঁর সামনে ফণা তুলে পথ রোধ করে দাঁড়ালো এক ভীষণ সাপ। যে সে সাপ নয়। সে সর্পরাজ তক্ষক।

তক্ষক চোখ রাঙ্গিয়ে অর্জুনকে সেই বন করেছিল আর সেই তপস্যার ফলস্বরূপ ইন্দ্রদেব তক্ষককে রক্ষা করার বর দিয়েছিলেন।

এবার বাঁধল যুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে।

না আছে রাত্রি যাপনের কোনো স্থান। বসবাসের তো উপযুক্ত নয়ই। এই সেই খণ্ডপ্রস্থ। আর ভয়াবহ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি খাণ্ডববন। মামা শকুনির কথায় দুর্যোধন অর্ধেক রাজত্ব তো নয়ই, নিদেনপক্ষে পাঁচটি গ্রামও দিতে রাজি না হয়ে শেষমেশ হস্তিনাপুরের কাছে এই খণ্ডপ্রস্থ পাণ্ডবদের দিয়েছিল।

পঞ্চপাণ্ডব সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এল খণ্ডপ্রস্থে। চারদিক দেখে নিয়ে কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তাঁরা প্রবেশ করলেন সেই ভয়াবহ জঙ্গলে। কুটির বাঁধলেন। অর্জুন গেলেন জল ও খাবারের খোঁজে। অনেক খুঁজে একটি কুয়ো থেকে জল নিয়ে ফিরছেন। পরিত্যাগ করে চলে যেতে বলল। সেই বনে নাকি শুধু সর্পকুলই বাস করতে পারে। অর্জুন অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তক্ষক দ্রৌপদী-সহ তাদের ক্ষতি করবে বলে জানায়। আর শান্ত থাকা যায় না। অর্জুন হাতে তুলে নিলেন গাণ্ডীব।

আশ্চর্যের বিষয়, অর্জুনের নিক্ষেপ করা একটিও বাণ সর্পরাজ অবধি পৌঁছলো না, তার আগেই অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। অর্জুন বুঝলেন, গোপনে থেকে কেউ তক্ষককে রক্ষা করছে। অর্জুন আহ্বান করলেন তক্ষকের রক্ষাকারীকে। আত্মপ্রকাশ করলেন তক্ষকের রক্ষক —দেবরাজ ইন্দ্র। এতে দেবরাজের কোনো দোষ নেই। তক্ষক দেবরাজের তপস্যা দেবরাজ ইন্দ্রেরই অংশ অর্জুন। যতবারই যুদ্ধ করছেন অর্জুন, ততবারই পরাস্ত হয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে সূর্যদেবের তপস্যা শুরু করলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রকে পরাস্ত করার অস্ত্র প্রদান করলেন। ইন্দ্রদেব হার মানলেন। তক্ষককে পাতালে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হলো।

ইন্দ্রদেব তাঁর জয়ের পুরস্কার স্বরূপ অগ্নিদেব কর্তৃক সেই খাণ্ডববন দহনের পর প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে দিলেন। তারপর ময়দানবের সহায়তায় তৈরি হলো পাণ্ডবদের স্বপ্নের রাজধানী— ইন্দ্রপ্রস্থ।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

পর্বত পরিচয়

উত্তরবঙ্গের পর্বত

সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা এক হাজার মিটারের বেশি হলে তাকে পর্বত বলে চিহ্নিত করা হয়। উত্তরবঙ্গের সমস্ত পর্বতশৃঙ্গ হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত। সিংগালিলা পর্বতশ্রেণীর উচ্চতম শৃঙ্গের নাম সান্দাকফু। এর উচ্চতা হলো ৩৬৩৬ মিটার। দার্জিলিং-কার্শিয়াং রেঞ্জের উচ্চতম শৃঙ্গ হলো টাইগার হিল। এর উচ্চতা ২৬০০ মিটার। চোলা রেঞ্জের উচ্চতম শৃঙ্গ হলো ডেলো হিল। এর উচ্চতা ১৭০৪ মিটার। বক্সা-জয়ন্তী রেঞ্জের উচ্চতম শৃঙ্গ হলো বক্সা হিল। এর উচ্চতা হলো ১৪০০ মিটার।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৩১

ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে

দ্রৌপদী–দ্রৌপদী । দ্রৌপদ্যা:–দ্রৌপদীর।

দ্রৌপদ্যা: পতি: অর্জুন:। – দ্রৌপদীর পতি অর্জুন।

অভ্যাস করি–১

দেবীর - দেব্যা:, শঙ্করীর - শাঙ্কর্যা:, মালতীর-মালত্যা:, গৌতমীর- গৌতম্যা:, পার্বতীর- পার্বত্যা:, মৌসুমীর- মৌসুম্যা:।

অভ্যাস করি--২

কুন্ত্যা: পুত্র: কর্ণ:। গৌর্যা পতি মহাদেব:। মৌসুম্যা: ভ্রাতা সুমন:। চৈতাল্যা: সখী সোমা। মাধব্যা: মাতা কমলাদেবী।

বিঃ দ্রঃ - ঈ-করান্ত স্ত্রীলিঙ্গে নামের সঙ্গে ্যাঃ/্যা: হবে। এখন অনুরূপ কয়েকটি বাক্য তৈরি করতে হবে।

ভালো কথা

সততা

এখন মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের শাখার সুকেশদা প্রতিদিন ছাতা নিয়ে শাখায় আসেন। সেদিন শাখায় যাবার সময় বললেন, কাল ছাতাটি মাঠে ছেড়ে এসেছেন। তারপরেই বললেন, যে আমাকে ছাতাটি দিয়েছেন, সে যদি শুদ্ধ মনে এবং সৎভাবে উপার্জনের টাকায় ছাতাটি আমাকে দিয়ে থাকেন, তাহলে ছাতাটি নিশ্চয় পাব। পরদিন শাখায় অদ্বৈতদা এসেছিলেন। মণ্ডলতে বসে অদ্বৈতদা কিছু বলছিলেন, তখন মাঠে যারা পূজার প্যান্ডেলের কাজ করছিলেন, তাদের একজন বললেন, গতকাল কি আপনারা কিছু ছেড়ে গেছেন? সুকেশদা বললেন, হ্যাঁ, একটা ছাতা। ভদ্রলোকটি তখনই তাদের তাঁবু থেকে ছাতাটি এনে সুকেশদার হাতে দিলেন। সুকেশদা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

নীল সুর, নবমশ্রেণী, বলাই সিংহ লেন, কল-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভাইটি আমার

পৃথা সেন, নবম শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

হাঁটতে শিখে ভাইটি আমার
টলতে টলতে হাঁটে
হাঁটতে হাঁটতে পড়ে গেলেই
মা মা করে কাঁদে।
ফোকলা মুখে ভাইয়ের হাসি
দেখতে ভারী মিষ্টি
ফোকলা মুখে দিদি ডাক
শুনতেও ভারী মিষ্টি।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

সর্পাঘাত : প্রাথমিক প্রতিবিধান ও চিকিৎসা

ডাঃ অমিত ভট্টাচার্য

কোনো মানুষকে অন্ধকারে কিছু কামড়ালো। সেটা সাপের কামড় না অন্য কিছুর কামড় সেটা নিয়ে, খুব বেশি চিন্তা করার কিছু নেই। সেই ব্যক্তির যেটা কর্তব্য হবে সেটা হলো কাছাকাছি সরকারি হাসপাতালে যাবার চেষ্টা করা। সেখানে গিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ডাক্তারবাবুরা রোগীর রোগ লক্ষণ দেখে বুঝতে পারবেন যে এটা সাপের কামড় না ইঁদুর কামড়েছে, না অন্য পোকামাকড় কামড়েছে।

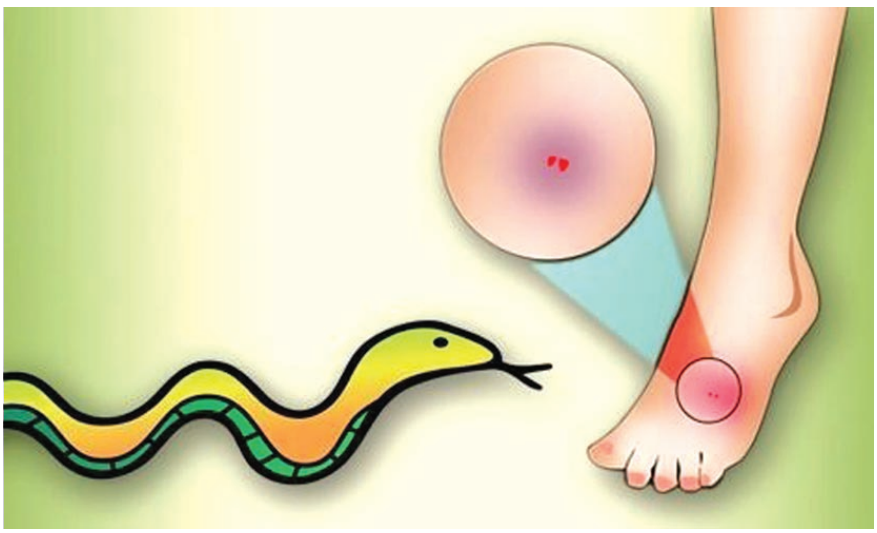

বিষধর সাপের কামড়ের কিছু লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ফণাযুক্ত সাপ যেমন কেউটে বা গোখরো জাতীয় সাপে কামড়ালে চামড়ার উপরে দাগ দেখা যেতে পারে। যেমন দুটো ফুটো দেখা যেতে পারে, একটা ফুটো দেখা যেতে পারে অথবা দুটোর বেশি ফুটো দেখা যেতে পারে। আর ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে সেই জায়গাটা খুব জ্বালা করতে শুরু করে। প্রচণ্ড জ্বলন হতে শুরু করবে, ক্রমশ জায়গাটা ফুলে যাবে, চামড়াটা কালচে হয়ে যাবে।

চন্দ্রবোড়া সাপে কামড়ালেও দাগ দেখা যেতে পারে। জায়গাটা ধীরে ধীরে ফুলতে থাকবে এবং আস্তে আস্তে জ্বালা যন্ত্রণা বাড়তে থাকবে। ফণাযুক্ত সাপের ক্ষেত্রে যেমন সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালা হয়, চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে একটু ধীরে ধীরে হয়।

কিন্তু আর একটি সাপ সম্পর্কে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। সেটি হলো কালাচ বা কালচিতি সাপ। এরা রাত্রিবেলায় বিছানায় উঠে আসে। যদি মশারি খাটানো না থাকে, তবে এরা বিছানায় উঠে এসে কামড়ে দেয়। এদের কামড় খুব সূক্ষ্ম ধরনের, বোঝাই যায় না। ঘুমের মধ্যে কামড়ালে, সাপে যে কামড়েছে সেই ব্যাপারটা বোঝাই যাবে না। তাহলে কামড়েছে বোঝা যাবে কী করে? সাধারণভাবে সকালে উঠে পেটে ব্যথা শুরু হয়। অনেকে গলাব্যথা নিয়ে আসে, কেউ-বা বলে শরীরটা ভালো লাগছে না, শরীরটা টলটল করছে। এই ক্ষেত্রে কামড়ের দাগ হয়তো দেখাই যাবে না। তবে একটি নির্দিষ্ট রোগ লক্ষণ কয়েক ঘণ্টা পরে আসবে, সেটা হলো চোখের পাতা নেমে আসা বা শিবনেত্র হয়ে যাওয়া। দুই চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই ব্যক্তিকে গত রাতে কালাচ সাপে কামড়েছে।

সাপের কামড় বা অজানা কামড় নিয়ে কেউ হাসপাতালে এলেই তাকে ভর্তি করে নেওয়া উচিত। ভর্তি করে স্যালাইন চালু করতে হবে। আর রুগিকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যখনই কোনো রোগলক্ষণ দৃশ্যমান হবে, তখনই স্যালাইনের সঙ্গে Anti Venum Serum বা AVS চালু করে দিতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কী করবেন?

কামড়ের পরে রোগীকে নাড়াচাড়া কম করবেন এবং লোকজনকে ডেকে নেবেন। আগে বাঁধন দেওয়া হতো। এখন বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে বাঁধন দিয়ে খুব লাভ হয় না। তবে রুগি নিজে নড়া চড়া করবে না। অন্য লোকেরা তাকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। পারলে মোটর বাইকে বসিয়ে। সাপের কামড়ের সঙ্গে ইঁদুরের কামড় খুব গুলিয়ে যায়। আর একটি আছে, যার সঙ্গে গুলায় সেটি হলো কাঁকড়া বিছের কামড়। কাঁকড়া বিছে কামড়ালে, জায়গাটায় তীব্র জ্বলন অনুভব হয়। কিন্তু জায়গাটা ফুলবে না। সাপে কামড়ালে জায়গাটি ফুলে যাবে।

মোট কথা, কীসে কামড়েছে সেটা বিবেচনা করার দরকার নেই। অতি দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছতে হবে। কীসে কামড়েছে সেটা দেখার জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। এতে দশ মিনিট সময় নষ্ট হলেও রুগির তাতে ক্ষতি হতে পারে। □

সর্পাঘাত রোধ কীভাবে?

ডাঃ সোমনাথ ব্যানার্জি

সাপের চলাচলের পথ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা দরকার। গ্রামে রাতবিরেতে মাঠঘাটে চলার সময় টর্চ ও লাঠির ব্যবহার প্রয়োজন। লাঠি ঠুকে চলার মধ্যে সাপকে এড়িয়ে চলা যায়। সর্পপ্রবণ এলাকায় ভালো করে মশারি খাটিয়ে শোওয়া, মাটিতে না শোওয়া, বিছানা তুলনামূলক বড়ো রাখা যাতে মশারির গায়ে শরীর স্পর্শ না করে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সাপ যাতে বাড়ির কাছাকাছি না আসে, তার কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। সাপ গৃহ পরিবেশে আসে খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য। এই অবাঞ্ছিত আমন্ত্রণ রোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যেমন সাপের মূল খাদ্য ইঁদুরের সমস্ত বাসা ভেঙে দিতে হবে। পোষা প্রাণীর খাবার বাইরে খোলা রেখে সাপকে আকৃষ্ট করা যাবে না। বাড়ির কাছে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন আগাছাময় এলাকা, ঘাসজমি ছেঁটে ফেলতে হবে। স্যাঁতসেঁতে এলাকা যা সাপ পছন্দ করে, সেখানে নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। বাড়ির ত্রিসীমানার বড়ো ফুটোগুলো যথাসম্ভব বন্ধ করে দিতে হবে। ভেন্টিলেটর ও নর্দমার মুখের আচ্ছাদন যথাযথ হওয়া চাই। জানালার পাল্লা, কাচ মজবুত রাখা জরুরি। জানালা বেয়ে উঠে আসতে পারে এমন লতা বা গুল্মশাখা কেটে দিতে হবে। দুয়ার নিয়মিত ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রাঙ্গণে জমা করে রাখা জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে হবে। উঠোনে বা খামারে সাপ ধরার ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

দংশন পরবর্তী কৃত্য :

ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে বছরে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় বলে শোনা যায়। অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু ভারতবর্ষের চাইতে বিষধর সাপের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও সেখানে প্রতি পাঁচ বছরে সাপের কামড়ে মারা যায় দুই থেকে তিন হাজার মানুষ। সচেতনতাই সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমাতে পারে। সর্পাঘাতের পর মানুষ ওঝা-গুণিনের কাছে না গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নির্ভরযোগ্য হাসপাতালে পৌঁছায়, তা দেখতে হবে এবং সেটা যত দ্রুত সম্ভব।

সাপের কামড়ের দাগ পর্যবেক্ষণ করে একসময় বোঝার চেষ্টা হতো, তা বিষহীন না বিষধর সাপের দংশনে হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিভ্রান্তি হতে পারে। দংশিত ব্যক্তির লক্ষণ দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শ্রেয়। বিষ যদি থাকে তবে তার চিহ্ন শরীরে ফুটে ওঠে। চিকিৎসক বিষের চিহ্নগুলি বিশদে বোঝার চেষ্টা করেন।

সাপের কামড়ে মৃত্যু রোধ করতে মানতে হবে 'রুল অব হান্ড্রেড'। সাপ কামড়ানোর ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ মিলিমিটার এএসভি শরীরে প্রবেশ করাতে হয়। আর মানতে হয় আরআইডিএইচটি (রাইট) ফরমূলা। তা হলো 'আর' অর্থাৎ রিঅ্যাসুয়েরেন্স বা আশ্বস্ত করা, 'আই' অর্থাৎ ইমমোবিলাইজেশন বা ক্ষতস্থান যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করা, 'জিএইচ' বা গোটু হসপিটাল অর্থাৎ নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যেখানে এএসভি মজুত আছে, 'টি' অর্থাৎ টেল ডক্টর ফর ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ চিকিৎসা শুরুর লক্ষ্যে ডাক্তারকে বিস্তারিত জানানো।

ডাক্তার জানবেন দংশিত ব্যক্তি কত সময় ধরে কথা বলতে অসুবিধা বোধ করছে, কতক্ষণ ধরে তার চোখের পাতা বুজে আসছে, কত সময় ধরে নাকি সুরে কথা বলছে, পেটে ব্যথা কত সময় ধরে, বমি হচ্ছে কতক্ষণ, দংশিত জায়গাটি কতটা ফুলেছে ইত্যাদি। কারণ সাপের বিষ রক্তে ঢোকার পর মাথা ঝিমঝিম করে, নুইয়ে পড়ে চোখের পাতা, জড়িয়ে যায় কথা, নাকিস্বরে কথা হয়, বমিভাব বা গা-গোলানো শুরু হয়, মুখ থেকে ফেনা বেরোতে থাকে, খিঁচুনি হয়, রক্তচাপ কমে যায়, রোগী অজ্ঞান-অচেতন হয়ে পড়ে, রক্তজমাট ঘটে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাপে কামড়ানোর পরও বিশেষ লক্ষণ ফুটে ওঠে না। এক্ষেত্রে আরও বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

সর্পাঘাতের পর মানুষ আতঙ্কেই মরে বেশি। আক্রান্ত ব্যক্তিকে বোঝাতে হবে, সাপ কামড়ালেই মানুষ মরে না। অযথা ভয় পাওয়ার কারণে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। কোনো বাঁধন দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। ক্ষতস্থানটি কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটারও দরকার নেই। দরকার নেই সাপ ধরে আনার। রোগীকে দৌড় করিয়ে হাসপাতালে আনতে নেই। রোগী নিজে সাইকেল বা বাইক চালিয়েও হাসপাতালে আসবেন না। বরং তাকেই যত দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে।

সাপের দংশনজনিত চিকিৎসার মূল বিষয় হচ্ছে অ্যাট্রোপাইন এবং নিওস্টিগমিন ইনজেকশন। আর দিতে হয় অ্যান্টি স্নেক ভেনম (ASV) দশ ভায়েল লোডিং ডোজ। অ্যাট্রোপাইন ও নিওস্টিগমিন সাপের কামড়ের চিকিৎসায় বিশেষত কোবরা জাতীয় সাপের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে দংশনজনিত ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুতন্ত্রের উন্নতি ঘটায়। অ্যাট্রোপাইন এবং নিওস্টিগমিন চন্দ্রবোড়া সাপের চিকিৎসাতেও ভালো কাজ করে। সাপের শনাক্তকরণেও সাহায্য করে এই ওষুধ। এক ঘণ্টায় তিনটি ডোজ দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুতন্ত্রের কোনো উন্নতি না ঘটলে, দংশন যে কোবরা জাতীয় সাপের কামড়ে হয়নি তা অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে মনে করা হয় কালাচ জাতীয় সাপের কামড়ে তা হয়েছে। স্নায়ুতন্ত্রের উন্নতি বোঝা যায় রোগীর চোখের পাতা খুলতে পারার ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে। কালাচ সাপের কামড়ে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ১০ মিলিলিটার পরিমাণ ইন্ট্রাভেনাস বা শিরার মধ্যে প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হয়। কালাচের দংশনে স্নায়ুর অক্ষমতা বা নিউরোপ্যারালিসিস এক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে।

এভিএস-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেলে অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন ভালো কাজ করে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এই ইনজেকশন মজুত রাখা জরুরি। এভিএস ইনজেকশন শুরু করার আগে সাবকিউটেনিয়াস বা চামড়ার তলাতে ০.২৫ মিলিলিটার অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশন দিয়ে নিলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেকটাই প্রতিহত করা যায়।

(কৃতজ্ঞতা : ড. কল্যাণ চক্রবর্তী)

মানুষের ওপর আস্থা হারিয়ে সন্ত্রাসের আবহে উপনির্বাচনে চার বিধানসভার দখল নিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে লাগামহীন সন্ত্রাস চালিয়ে চমকপ্রদ ফল করলেও রাজ্যে চার কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষের ওপর ভরসা রাখতে পারলো না শাসক তৃণমূল দল। লোকসভা ভোট পরবর্তী হিংসার আবহের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো রাজ্যের চার কেন্দ্রের. বিধানসভা উপনির্বাচন। গত ১০ জুলাই রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, নদিয়ার রানাঘাট (দক্ষিণ) ও কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে সমাপ্ত হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল যেভাবে সন্ত্রাসের আবহে ভোট করেছে সেই একই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা উপনির্বাচনেও। উপনির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকে রাজ্যজুড়ে একের পর এক অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো থেকে বুথজ্যাম, মারধর, গাড়ি ভাঙচুরের খবর আসতে শুরু করে। উল্লেখ্য, রাজ্যের যে চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছে তার সবকটিতে লোকসভা ভোটে শতাংশের নিরিখে ভালো ফল করেছে বিজেপি। আর এটাই তৃণমূলের কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি শাসক তৃণমূল। উপরতলার নির্দেশে শাসক দলের শাজাহানরা বুথ কেন্দ্রগুলি নিজেদের কবজায় নিতে শুরু করে। ভোট প্রক্রিয়া কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়। বুথগুলির মধ্যে এবং বাইরে পর্যাপ্ত পুলিস বাহিনী মোতায়েন থাকলেও কার্যত তাদের ঠুটো জগন্নাথ করে রাখা হয়।

মানিকতলা কেন্দ্রে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসক দলের বুথ জ্যাম, থেকে শুরু করে বাইক বাহিনীর দৌরাত্ম্য। শুরু হয়ে যায় বুথ ধরে ধরে ছাপ্পা ভোট। খবর পেয়ে বিজেপির কল্যাণ চৌবে প্রতিবাদ করলে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীরা তার ওপর চড়াও হয়ে গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। যদিও কল্যাণের দাবি এই কেন্দ্র ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মানিকতলা ৮৯ বুথে ব্যাপক এবং অবাধে ছাপ্পা ভোট পড়েছে। এই বুথে পুনর্নির্বাচনের জন্য তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

অন্যদিকে, বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের অবস্থাও একই। এই কেন্দ্রেও সকাল থেকে তাণ্ডব চালায় তৃণমূলি সন্ত্রাসী বাহিনী। সেখানে বিজেপি প্রার্থী বিনয় বিশ্বাসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। রীতিমতো তাঁকে তাড়া করে এবং তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তৃণমূলের সন্ত্রাসের হাত থেকে বাদ যায়নি সাংবাদিকরা। এই কেন্দ্রের পাঁচটি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলা হয়েছে। একই চিত্র দেখা গিয়েছে রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে। রাণাঘাট দক্ষিণে পায়রাডাঙ্গায় বিজেপি পোলিং এজেন্ট শ্রাবন্তী দে-র বাড়ি ভাঙচুর ও গুলি চালানো হয়। পায়রাডাঙ্গায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম বিশ্বাস। যদিও পুলিশ এই ঘটনায় ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

শাসক দলের ভোট-সন্ত্রাস থেকে বাদ যায়নি রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র। এখানে ভোটের আগে থেকেই বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসানির অভিযোগ উঠেছে। ভোট দান হবার পর থেকেই বুথগুলোর মধ্যে তৃণমূল কর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে। বিজেপি কর্মী প্রতিবাদ করলে শুরু হয় গণ্ডগোল। উভয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শুরু ধস্তাধস্তি ইটবৃষ্টি। বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার বিশ্বাসকে ঘিরে বিক্ষোভ, গোব্যাক স্লোগান এবং তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরে এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেন, নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করেছে।

বিজেপির দাবি, রাজ্যের চার কেন্দ্রে ভোটের নামে দেদার ছাপ্পা ও ভোট লুঠ হয়েছে। এত সন্ত্রাসের মধ্যেও রাজ্য পুলিস ও তার বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যায়। আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি নেতা থেকে প্রার্থী। চলেছে গুলি। এবারের উপনির্বাচনে সব বুথে ওয়েবকাস্টিঙের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি এই চার কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়েছিল ৭০ কোম্পানি বাহিনী। এতো কিছুর পরও সুষ্ঠুভাবে মেটানো সম্ভব হয়নি এই চার কেন্দ্রের নির্বাচন প্রক্রিয়া। ফলে ব্যাপক উত্তেজনা, বাকবিতণ্ডা, গুলি চালানো আবহে রাজ্যের চার কেন্দ্রের উপনির্বাচন শেষ হয়।

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চার কেন্দ্রের ভোটের হার ৬২.৭১ শতাংশ। এর মধ্যে রায়গঞ্জে ভোটের হার ৬৭.১২ শতাংশ, রাণাঘাট দক্ষিণে ভোটের হার ৬৫.৩৭ শতাংশ, বাগদা কেন্দ্রে ভোটের হার ৬৫.১৫ শতাংশ এবং মানিকতলা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫১.৩৯ শতাংশ।

১৩ জুলাই ভোট গণনা পর্ব শুরু হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের চার কেন্দ্রে তৃণমূলের মার্জিন বাড়তে দেখা যায়। দিনের শেষে রাজ্য বিধানসভা উপনির্বাচনে চারটি কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তৃণমূল। ফলে ২০২১ সালে জেতা তিন কেন্দ্রে উপনির্বাচনে হারলো বিজেপি। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিধায়ক সংখ্যা কমে গেল। শনিবার বাগদার প্রার্থী বিনয় বিশ্বাস গণনাকেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার সময় তৃণমূল কর্মীরা তাকে ঘিরে জয়বাংলা স্লোগান দিতে থাকে। পরে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাঁকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই কেন্দ্রটি আমাদের জেতা কেন্দ্র ছিল। তৃণমূল এখানে সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি না করলে এই কেন্দ্রটি আমরা ধরে রাখতে পারতাম। অন্যদিকে এই কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী জানান, তৃণমূল স্তরে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা বিজেপি ভাবে না। তাই বিজেপিকে এই কেন্দ্রের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতছে তৃণমূল। রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন মতুয়া পরিবারের সদস্য সাংসদ মমতাবালার কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর।

অন্যদিকে রায়গঞ্জ আসনটিও বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। এই কেন্দ্রে লোকসভা ভোটে কৃষ্ণ কল্যাণীকে পরাজিত করেছিলেন বিজেপি কার্তিক পাল। কিন্তু বিধানসভা উপনির্বাচনে ফের কৃষ্ণ কল্যাণীর ওপর ভরসা রেখেছে শাসক তৃণমূল। এবারে তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোজ বিশ্বাসকে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে হারিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে এই বিধানসভা থেকে২১ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। তখন তিনি অবশ্য বিজেপিতে ছিলেন। □

রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে ভূষিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ জুলাই রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার— 'দ্য অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টল্'-এ সম্মানিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে রাশিয়ার তরফে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্মান প্রদানের বিষয়টি

ঘোষিত হয়। ভারত ও রাশিয়ার বিশেষ কৌশলগত সমঝোতা (স্পেশাল অ্যান্ড প্রিভিলেজড্ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ) এবং দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান প্রদানের বিষয়ে ঘোষণা করে ভারতে অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাস। কৌশলগত প্রক্রিয়ায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি কৃতিত্ব ছাড়াও রাশিয়ান ও ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদানের কথা রাশিয়ান দূতাবাসের তরফে ঘোষিত হয়। বিভিন্ন দেশের বরেণ্য রাজনীতিক, প্রশাসনিক আধিকারিক, সমরনায়ক, কলা-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের রাশিয়ার প্রতি উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান প্রদান করে থাকে রাশিয়া। রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতি অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদেরও এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। যীশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁর অন্যতম অনুগামী ও শিষ্য সেন্ট অ্যান্ড্রু রাশিয়া, গ্রিস-সহ ইওরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে যীশু খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেন। তিনি ছিলেন 'দ্য চার্চ অফ কনস্ট্যান্টিনোপল'-এর প্রতিষ্ঠাতা, যা পরবর্তীকালে রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে ১৪ কোটি জনসংখ্যার দেশ রাশিয়ায় ৯ কোটিরও বেশি রাশিয়ান অর্থোডক্স মতাবলম্বী। রাশিয়া ও স্কটল্যান্ড— দুই দেশেই সেন্ট অ্যান্ড্রু 'প্যাট্রন সেন্ট' হিসেবে সম্মানিত ও সমাদৃত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক রাশিয়া সফর চলাকালীন ক্রেমলিনের সেন্ট অ্যান্ড্রু হলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীজী সব ভারতীয়দের উদ্দেশে এই পুরস্কারকে উৎসর্গ করে তাঁর এক্স-হ্যান্ডেলে ট্যুইট করেন— 'Honoured to receive the Order of St. Andrew the Apostle. I dedicate it to the people of India.'।

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য। যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

'১৯৮৬ সালের আইন প্রযোজ্য নয়' মুসলমান মহিলাদের খোরপোশ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ জুলাই একটি ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর বা সিআরপিসি-র ১২৫ নং ধারা অনুযায়ী মুসলমান মহিলারাও তাদের স্বামীদের থেকে খোরপোশ দাবি করতে পারেন। সিআরপিসি-র এই ধারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সব মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। বিচারপতি বিভি নাগরত্নে ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ তাঁদের দেওয়া এই রায়ে জানিয়েছে যে 'দ্য মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস্ অন ডিভোর্স) অ্যাক্ট, ১৯৮৬' আইনটি সিআরপিসি-র ১২৫ নং ধারার ওপর প্রাধান্য পাবে না। দুটি আইন একযোগে বলবৎ হওয়ার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ বিধি হিসেবে সিআরপিসি-র ১২৫ নং ধারাটি ১৯৮৬ সালে প্রণীত ওই আইনের পরিবর্তে প্রযুক্ত হবে। স্ত্রীদের প্রতি তাদের স্বামীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে শীর্ষ আদালত এই রায়ে যৌথ (জয়েন্ট) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, স্বামী-স্ত্রীয়ের মধ্যে এটিএম কার্ডের মিলিত অ্যাক্সেস বা যৌথভাবে ব্যবহারের সুযোগের বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে। ১২৫ নং ধারায় খোরপোশের দাবি সংবলিত কোনো মামলা চলাকালীন কোনো মুসলমান মহিলার ডিভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে, সেই মহিলা ১২৫ ধারার পাশাপাশি — 'দ্য মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস্ অন ম্যারেজ) অ্যাক্ট, ২০১৯' আইনেরও সাহায্য নিতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাহ বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়কে ঘুরিয়ে দিতে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পর মুসলমান মহিলাদের প্রাপ্য খোরপোশ হতে বঞ্চিত করতে ১৯৮৬ সালে নারীবিদ্বেষী, অগণতান্ত্রিক আইনটি নিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

রাষ্ট্রপতি শাসন নয়, পশ্চিমবঙ্গে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার দাবি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৩ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নির্বাচন পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে কলকাতায়

রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ধরনায় শামিল হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের সন্ত্রাসে ঘরছাড়া ৩০০ জনকে নিয়ে রাজভবনের সামনে বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে চার ঘণ্টা অবস্থান-বিক্ষোভ ও ধরনা সংঘটিত হয়। শাসক দলের সন্ত্রাস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপশাসনের বিরুদ্ধে তিনি একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। লাগামছাড়া বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে সিইএসসি দপ্তর ঘেরাও, ভয়াবহ ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযান, শাসক দলের সন্ত্রাসে আক্রান্ত হিন্দুদের বাড়িতে যাওয়া, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কর্মসূচি ঘোষণা করে বিরোধী দলনেতা জানান যে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট জন বিজেপি সাংসদের একটি দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এই রাজ্যে সংবিধানের ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি তাঁরা করছেন না বলে জানিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন যে বিভিন্ন জেলায় শাসক দলের সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এমনকী শাসক দলের অনুগত, দলদাস সিভিক ভলান্টিয়াররা বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য মহিলাদের হুমকি দিচ্ছে, মারধোর করছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা যেখানে শাসক দলের মাত্রাছাড়া সন্ত্রাস চলছে সেই অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার দাবি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন বলে ধরনা মঞ্চ হতে বিরোধী দলনেতা ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত, সংবিধান অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিষয়। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সেই রাজ্যের প্রশাসনের ব্যর্থতায় সার্বিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিকে ডিসটার্বড্ এরিয়া বা উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে কেন্দ্র। এই স্থানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ভার সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর ন্যস্ত হয়। সেই এলাকায় জারি হয় কেন্দ্রীয় আইন—দ্য আর্মড্ ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট বা আফস্পা। মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে উপদ্রুত অঞ্চলে এই আইন বলবৎ রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী সেই অঞ্চলের বেলাগাম আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে। সম্প্রতি ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট মন্তব্য করে যে নির্বাচন মিটে গেলেও শাসক দলের হিংসা ও সন্ত্রাস অব্যাহত থাকলে সন্ত্রাস রুখতে রাজ্যে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখতে পারে কেন্দ্র। সন্ত্রাস-কবলিত এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী যেতে পারবে এবং টহল দিতে পারবে বলেও তাদের নির্দেশে উল্লেখ করে কলকাতা হাইকোর্ট। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের এই আবহের মধ্যে রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোসকে এই সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে রাজ্যপাল বলেন যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকলে তা মোকাবিলায় নানারকমের পথ রয়েছে। সংবিধানের ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা যেতেই পারে। বিরোধী দলনেতার তরফে সংঘটিত ধরনা-প্রতিবাদ, প্রধানমন্ত্রী সমীপে বিজেপি সাংসদদের দাবিপত্র উপস্থাপন, কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ এবং রাজ্যপালের রিপোর্টের সমন্বয়ে শাসক দলের সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে রাজ্যে সুস্থ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসে কিনা সেই বিষয়ে চিন্তিত রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষ।

শোকসংবাদ

মেদিনীপুর জেলার সম্পর্ক প্রমুখ জগমোহন আচার্যের পিতা কাশীনাথ আচার্য গত ৭ জুলাই, রথযাত্রার দিন ওড়িশার নয়াগড় গ্রামে (বাসভবনে) পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর, তিনি রেখে গেছেন পত্নী, ১ পুত্র, ১ কন্যা।

* * *

মালদহ নগরের বীর সাভারকর শাখার পূর্বতন মুখ্যশিক্ষক তথা সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্য সুধাকর মণ্ডলের মাতৃদেবী সুষমা মণ্ডল গত ১১ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

* * *

হুগলি জেলার চন্দননগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক নির্মল কুমার ঘোষ গত ৮ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে প্রতিদিনের সাংগঠনিক কাজে তাঁর যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রিত ছিলেন তিনি। চন্দননগরে 'হিন্দু মিলন মন্দির' স্থাপন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। স্বস্তিকা পরিবারের সঙ্গেও দীর্ঘ দিনের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তাঁর পরিবারের।

ভোজশালাতে উদ্ধার দেবদেবীর মূর্তি, উল্লেখ এএসআই রিপোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার রিপোর্ট জমা দিল আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)। গত ১৫ জুলাই মধ্যপ্রদেশের

হাইকোর্টে এই রিপোর্ট জমা পড়েছে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জমা পড়া দু'হাজার পাতার রিপোর্টে ভোজশালার জমির তলায় প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের অস্তিত্ব শনাক্ত ও প্রমাণিত হয়েছে হয়েছে বলে দাবি হিন্দু পক্ষের আইনজীবীর।

মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে কামাল মৌলা দরগা ও মসজিদ রয়েছে এএসআই তত্ত্বাবধানে। হিন্দুদের দাবি, ওই সৌধ আসলে রাজা ভোজের দেবী সরস্বতীর প্রাচীন মন্দির। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার হিন্দুদের পুজো দিতে দেওয়া হয় ভোজশালায়। মুসলমানদের শুক্রবার নমাজ পড়তে দেওয়া হয়। সপ্তাহের অন্যান্য দিন যে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু সেই দিনগুলিতে কাউকে পুজো দিতে বা নমাজ পড়তে দেওয়া হয় না। ঐতিহাসিক সৌধটিতে এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় হিন্দু সংগঠনগুলি। ২০২২ সালে হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষে আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টকে জানান— ২০০৩ সালে মুসলমানদের ভোজশালায় নমাজ পড়তে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে সেটি আসলে হিন্দু মন্দির।

বারাণসীর জ্ঞানবাপীর মতো ভোজশালাতে এএসআইয়ের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার আবেদন জানানো হয়েছিল হিন্দু পক্ষের তরফে। গত ১১ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এই আবেদন মেনে সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু মুসলমান পক্ষ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। গত ১ এপ্রিল বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় ছাড়পত্র দিয়েছিল ভারতের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষিকেশ রায় ও বিচারপতি পিকে মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চ বিতর্কিত কাঠামোর চরিত্র বদলের চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানায়। কেন্দ্রীয় সরকার, মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং ধার জেলা প্রশাসনকে সেই নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছিল। গত ১৫ জুলাই ভোজশালা সংক্রান্ত এএসআইয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে জমা পড়ার পর হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষে আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন বলেন যে ভোজশালায় প্রাচীন মন্দিরের ৯৪টি ভাঙা দেবদেবীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেই সঙ্গে পাথরে খোদাই করা পশুদের অবয়বও শনাক্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, মুসলমানদের ধর্মস্থানে পশুদের মূর্তি থাকে না। তাই অবিলম্বে ভোজশালায় নমাজ বন্ধ করা উচিত। এর আগে এএসআই রিপোর্টে প্রাচীন দেবমূর্তি ও মন্দিরের নিদর্শনের অস্তিত্বের কথা উল্লেখিত হওয়ার পরেই জ্ঞানবাপীতে ব্যাসজী কা তহখানায় পূজার্চনার অনুমতি দিয়েছিল বারাণসী জেলা আদালত। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে জমা পড়া এএসআই রিপোর্টে মন্দিরের দাবি জোরালো হলো হিন্দু পক্ষের।

পাত্রী চাই

বিএসসি, বি-টেক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। গুজরাটে কর্মরত, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ৩২ বছরের পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ : ৯৪৩৪২০৬৯৮৮

ভারতকে হুমকি দিল ইসলামিক স্টেট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে হুমকি দিয়ে সম্প্রতি একটি বিবৃতি জারি করেছে কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট। গত ১৪ জুলাই সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে যে আইসিস-খোরাসানের প্রচারবিভাগ বা মিডিয়া আউটলেট আল-অ্যাজেমের তরফে ১০ পৃষ্ঠার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি আদতে একটি জেহাদি নিবন্ধ, যার ছত্রে ছত্রে ভারতের বিরুদ্ধে ভয়ংকর বিষ উগড়ে দেওয়া হয়েছে। বিষাক্ত ও উসকানিমূলক এই লেখাটির শিরোনাম হলো— 'হিন্দু কিংস্ নিড অ্যানাদার মামুদ গজনভি'। সংবাদসূত্রে খবর, এই লেখাটিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে আইসিস-খোরাসান। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশের সুলতান মামুদ একাধিক বার ভারতে লুণ্ঠন চালায় এবং বহু মন্দির ধ্বংস করে। উত্তর-পশ্চিম ইরান থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত একদা দখল করা মামুদের অন্ধকার স্মৃতিকে উসকে দিয়ে ইসলামিক স্টেটের তরফে জারি এই বিবৃতি ভারতে কোনো সন্ত্রাসবাদী হানার ছক কিনা সেই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর চললো গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৩ জুলাই আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে একটি নির্বাচনী প্রচারসভায় ২০২৪ সালের আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য মনোনীত প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে ২০ বছর বয়সি টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। ঘটনাচক্রে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি তখন পেনসিলভেনিয়ায় আয়োজিত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' লেখা একটি লাল টুপি।

গুলিটি ট্রাম্পের ডান কানের ওপরের অংশ ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তে তাঁর কান ও গালে গলগল করে রক্ত বেরোতে দেখা যায়। তাঁর নিরাপত্তায় নিযুক্ত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা মঞ্চে উঠে তাঁকে ঘিরে ফেলেন। গুলিতে আহত ট্রাম্প ক্ষণিকের জন্য শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়লে সিকিউরিটি এজেন্টরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরে ফেলেন এবং তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। এই সময়ে মাইক্রোফোনে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়— 'লেট মি গেট মাই শ্যুজ'। উঠে দাঁড়ানোর পর ৭৮ বছর বয়সি প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফের জনতার মুখোমুখি হন। রক্তাক্ত অবস্থাতেও ট্রাম্প লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতীকস্বরূপ তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রদর্শন করেন। এজেন্টরা তাঁরে ঘিরে নিয়ে গিয়ে একটি এসইউভি গাড়িতে তোলার আগেও জনতার উদ্দেশে ট্রাম্প তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখান।

গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে আতঙ্ক ও ভীতির পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ে। সভায় উপস্থিত একজন গুলিতে নিহত হয়, দু'জন গুরুতরভাবে জখম হয়। নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে বন্দুকবাজ ক্রুকসেরও মৃত্যু ঘটে। যে বাড়ির ছাদে উঠে ট্রাম্পের উদ্দেশে সে গুলি চালিয়েছিল— অসমর্থিত সূত্রে প্রকাশিত একটি ছবিতে সেই ঢালু ছাদটিতেই তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এই ঘটনার পর একটি প্রেস কনফারেন্সে এফবিআইয়ের তরফে এই ঘটনাকে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা (অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্পট্) বলে জানানো হয়। এই ঘটনার সাক্ষী কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান যে গুলি চালানোর আগে বন্দুকবাজ ক্রুকসকে তারা ঘটনাস্থলে দেখতে পেয়েছিলেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে সতর্কও করেছিলেন। ক্রুকসের সন্দেহজনক গতিবিধির ব্যাপারে তারা খবর পেয়েছিল বলে জানালেও এই বিষয়ে বিশদে জানাতে অস্বীকার করে বাটলারের স্থানীয় পুলিশ। ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয় যে সভার অনতিদূরে একটি বাড়ির ছাদ থেকে বন্দুকবাজ ক্রুকস সভামঞ্চ লক্ষ্য করে একাধিক গুলি ছোঁড়ে। এরপর তাকে 'নিউট্রালাইজ' করা হয়েছে।

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর ট্রুথ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ট্রাম্প জানান— 'আমাদের দেশে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা অবিশ্বাস্য'। তিনি আরও বলেন যে কানের পাশে একটা শব্দ পাই। সেই আওয়াজ পাওয়ার পরেই কানের চামড়া ফুঁড়ে বুলেট বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করি। তারপর অনেকটাই রক্তপাত হয়। তখন বুঝতে পারি কী ঘটনা ঘটেছে।

এই ঘটনার পরই ভারত, ব্রিটেন, ইজরায়েল, জাপান ও অন্যান্য দেশগুলির তরফে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। রাশিয়ার তরফে এই ঘটনার জন্য সরাসরি বাইডেন প্রশাসনের দিকে আঙুল তোলা হয়। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন যে ট্রাম্পের ওপর এই প্রাণঘাতী হামলার পিছনে বাইডেন প্রশাসনের হাত আছে এই দাবি আমরা করছি না। কিন্তু আমেরিকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায়, হিংসা রুখতে বাইডেন প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ। এই ঘটনার পর বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ডেলাওয়্যার বিচ হাউসে তাঁর সপ্তাহান্তের ছুটি কাটছাঁট করে ওয়াশিংটনে ফিরে আসেন। ট্রাম্পের ওপর গুলি চালনার এই ঘটনাকে 'অসুস্থ' বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার কোনো স্থান আমেরিকায় নেই। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা যায় যে গত ১৪ জুলাই সকালে নিরাপত্তা আধিকারিকরা তাঁকে এই বিষয়ে আপডেটেড ব্রিফিং করেন। আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট (উপরাষ্ট্রপতি) পদে রিপাবলিকান পার্টির তরফে সম্ভাব্য মনোনীত প্রার্থী জে.ডি. ভান্স বলেন যে বাইডেনের উসকানিমূলক কটাক্ষ ও বক্রোক্তির ফলেই ট্রাম্পের ওপর সংঘটিত হয় এই আক্রমণ। ঘটনার পর একটি হাসপাতালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। তারপর তাঁর নির্বাচনী প্রচার টিম সূত্রে জানা যায় যে গুলিতে আহত হলেও মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিতব্য রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে তিনি যোগ দেবেন।

এই ঘটনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর এক্স-হ্যান্ডেলে ট্যুইট করেন— 'Deeply concerned by the attack on my friend, former President Donald Trump. Strongly condemn the incident. Violence has no place in politics and democracies. Wish him speedy recovery. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased, those injured and the American people.'।

প্রসঙ্গত, এর আগে ৪ জন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করার ইতিহাস রয়েছে। ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন, ১৮৮১ সালে জেমস্ এ. গারফিল্ড, ১৯০১ সালে উইলিয়াম ম্যাকিনলে এবং ১৯৬৩ সালে জন এফ. কেনেডি আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারান। এছাড়াও ১৯১২ সালে থিওডোর রুজভেল্ট, ১৯৮১ সালে রোনাল্ড রেগন এবং ২০২৪ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রাণে বাঁচলেও আহত হয়েছেন। আগামী ৫ নভেম্বর আমেরিকায় নির্বাচনের চার মাস আগে ট্রাম্পের ওপর গুলি চালনার এই ঘটনায় আসন্ন নির্বাচনে প্রবল মেরুকরণের সম্ভাবনা। এছাড়াও এই ঘটনার পর আমেরিকার সর্বত্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্যারিসে চরম অস্থিরতার মধ্যে অলিম্পিকস্ ঘিরে সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কবিতা আর প্রেমের শহর প্যারিসে এই বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অলিম্পিক গেমস্। 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ' নামে পরিচিত এই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ২৬ জুলাই। হাতে বেশি সময়ও নেই আয়োজকদের। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর আগে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কর্তাদের কপালে পড়েছে গভীর চিন্তার ভাঁজ।

করোনার কারণে গতবার পিছিয়ে গিয়েছিল অলিম্পিক। নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'বছর পরে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে অলিম্পিকস্ আয়োজন করেছিল টোকিয়ো। আর এবার, কবিতা ও প্রেমের শহর প্যারিসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অলিম্পিকস্। 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ' শুরু হতে সময় আর বিশেষ বাকি নেই। কিন্তু অবার অলিম্পিকস্ ঘিরে কেন হঠাৎ সংশয়? বর্তমানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থার ডামাডোলের কারণেই শঙ্কার কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে চিন্তা বাড়ছে ফরাসি প্রশাসনেরও। ভারতের মতো সে দেশেও সাধারণ নির্বাচন হয়েছে কিছু দিন আগেই। সেই নির্বাচনে কোনো দলই ম্যাজিক ফিগার পার করতে পারেনি, ফলে ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট। এখনও সরকার গঠন হয়নি সে দেশে। কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাও নিশ্চিত নয়। আগে ঠিক ছিল যে অলিম্পিকস্ উদ্বোধন করবেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আটাল। কিন্তু ভোটে খারাপ ফলের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। যে সমস্ত সরকারি আমলা অলিম্পিকস্ আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরাও ঠিক করে কাজ করতে পারছেন না। কারণ, তাঁদের প্রত্যেকের একটাই দুশ্চিন্তা, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে পারে তাঁদের।

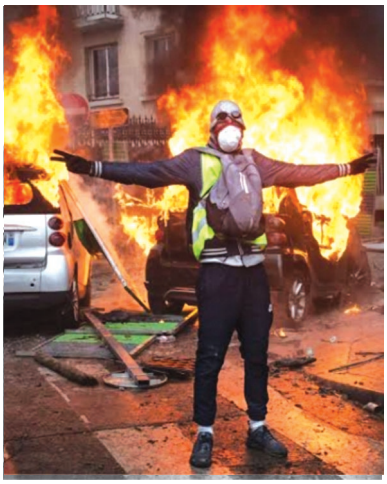

ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই ফ্রান্সে বামপন্থী (লেফটিস্ট) ও অতি-দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে তীব্র গণ্ডগোল চলছে। বামপন্থী দলের তরফে সংঘটিত আন্দোলন ও বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে উঠছে। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের রাস্তাঘাটে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি অবাধে ধ্বংস করে চলেছে বাম-মদতপুষ্ট ইসলামপন্থী জেহাদিরা। রাস্তায় নেমে আসা এই ভয়াবহ ডামাডোলের মধ্যে এখন রোজকার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্যারিসে ট্রাফিক জ্যাম। অলিম্পিকস্ চলাকালীন বাড়তি ভিড়ের কথা ভেবে নতুন মেট্রো লাইন তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। গেমসের দু-সপ্তাহ আগেও তা শেষ হয়নি। অলিম্পিকসের বাজেট বাড়তে বাড়তে ৩৬ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? নতুন সরকারে বামপন্থীরা থাকলে তারা সাধারণ মানুষের ওপর কর বসাতে দেবে? এসব ভেবে ঘুম উড়ে গিয়েছে ইম্যানুয়েল ম্যাক্রঁ প্রশাসনের।

অলিম্পিক আয়োজকদের দুঃখের তালিকা এখানেই শেষ নয়। হিসেব কষা হয়েছিল যে অলিম্পিকসের সময় প্যারিসের দুটো বিমানবন্দরে রোজ সাড়ে ৩ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করবেন। সেই মতো ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিমানবন্দরের কর্মীরা এখন বলছেন— তাঁরা মাইনে-বোনাসও নাকি ঠিক মতো পাচ্ছেন না। আর সে সব না পেলে অলিম্পিকসের সময়ে তাঁরা ধর্মঘট করবেন। প্রশাসনের তরফে সেই সব কর্মীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আপাতত ঠাণ্ডা করার চেষ্টা চলছে।

এদিকে প্যারিস অলিম্পিকসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নীলনকশা চুরি হয়ে গিয়েছে বলে জোর খবর। পুলিশ জানিয়েছে— এক ইঞ্জিনিয়ারের ল্যাপটপে সিকিউরিটি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ছিল। ট্রেনে তাঁর সেই ল্যাপটপ চুরি হয়ে যায়। আর সেটা উদ্ধার করা না গেলে শেষ মুহূর্তে অলিম্পিকসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আবার ঢেলে সাজাতে হতে পারে। সব মিলিয়ে প্যারিস অলিম্পিকস্ আয়োজন নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। একচুল এদিক-ওদিক হলেই ধাক্কা খাবে ফ্রান্সের ইমেজ। ফলে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রঁ কোন দিক কীভাবে সামাল দেবেন, তা নিয়ে অথই জলে পড়েছেন। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা